ভৈরব প্রসাদ হালদার

ছোটদের আইনস্টাইন

4·4

৮৪৭

ভৈরব প্রসাদ হালদার

পরিবেশক
বুক হোম
৩২, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আমার পুণ্যময়ী জননী
৺অনিলা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

এক

আঠার শ' পঁচাশি সাল।

শহর মিউনিখের শহরতলির একটি প্রাথমিক স্কুল।

সকালবেলা। স্কুলের ঘরে ঘরে ক্লাস বসেছে। ছেলেরা নীরবে মাস্টারমশায়ের পড়ানো শুনছে। বাইরে ঝলমলে রোদ। শহরতলির এ দিকটা খুবই শান্ত।

দ্বিতীয় মানের একটা ক্লাসে মাস্টারমশায় পড়া ধরছেন।

তাঁর সামনে একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত আর লাজুক। মনে মনে প্রশ্নের উত্তর ভাবছে।

—বল, গ্রহ কাকে বলে? মাস্টারমশায় আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেটা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রহ কাকে বলে? মনের অতলে ডুব দিয়ে তখনও সে জবাব হাতড়াচ্ছে। গ্রহ? শব্দটা সে শুনেছে। কিন্তু তার অর্থটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

এবার মাস্টারমশায় বললেন—এঃ ছেলেটা দেখছি একদম বোকা। একটুও বুদ্ধি নেই ওর মাথায়। দেখছ ত তোমরা। একটা সোজা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে না।

ক্লাসের অন্য ছেলেরা হেসে ওঠে।

উপহাসের ঝড় বইছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত হাসাহাসি সে কিন্তু নীরব। তার দেহ নিথর। সে মুখ নীচু করে তখনও ভাবছে।

—অ্যালবার্ট, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ, স্যার।

—তবে জবাব দিচ্ছ না কেন?

অ্যালবার্ট নীরব। প্রশ্নের জবাব খুঁজছে সে মনে মনে। অনেক ভাবছে, ভাবছে একটানা। পড়ার বইয়ের লেখাগুলো তার চোখের

সামনে ভাসছে। গ্রহ কি? প্রশ্নের সঠিক জবাবটা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ জবাব বলতে হবে তাড়াতাড়ি। সময় চাই।

কিন্তু মাস্টারমশায় ছাত্রের জবাব তাড়াতাড়ি শুনতে চান। তাঁর ধৈর্য কম। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে হবে ছাত্রদের। সঠিক হোক, বেঠিক হোক…জবাব একটা চাই। জবাব নিয়ে গড়িমসি করা চলবে না। যে ছেলে তাড়াতাড়ি জবাব দিতে পারে না সে বোকা। অথচ লেখাপড়া শেখার সাথে সাথে জীবনে চালাক হতে হবে সব ছেলেকে। স্কুলে যে ছেলে মাস্টারমশায়ের প্রশ্নের জবাব তাড়াতাড়ি দিতে পারে সেই ত সত্যিকারের চালাক ছেলে।

অথচ এখানেই অ্যালবার্টের যত অসুবিধে। প্রশ্নের সঠিক জবাব ভাববে মনে মনে—ভাবতে সময় নেবে। তারপর…সে জবাব কিন্তু সহজে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে না। এর ওপর মাস্টার-মশায়ের অধৈর্য-ভাব তাকে আরও ঘাবড়ে দেয়। শিশু ছাত্রকে আরও বিব্রত করে তোলে। অনেক ভেবে মনে মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করে আর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অ্যালবার্ট যখন জবাব দেওয়ার জন্যে মুখ খোলে তখন দেখে তার ওপর শাস্তির হুকুম জারি হয়ে গেছে। মাস্টারমশায় তার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

আর অন্য সব ছেলেরা তাকে দেখিয়ে হাসাহাসি করছে।

স্কুলকে তাই মস্ত বড় একটা জেলখানা মনে করত অ্যালবার্ট। একেবারে ছোটবেলা থেকেই এ ধারণা তার মাথায় ঢোকে। এখানে কোনও স্বাধীনতা নেই, নেই সামান্য একটুও ভালবাসা। আছে শুধু উপহাস আর তিরস্কার।

ক্লাসে বসে থাকতে তাই একটুও তার ভাল লাগত না। মাস্টার-মশায়ের পড়ানোর দিকে মন দিতে পারত না। স্কুল নয় যেন আটক ঘর। স্কুল থেকে একছুটে বাড়ি পালিয়ে যাওয়ার একটা দারুণ ইচ্ছে মাথা কুটতো অ্যালবার্টের মনের দেওয়ালে।

বাড়িতে কিন্তু এই শান্ত-শিষ্ট ছেলেটাকে সবাই ভালবাসত।

অ্যালবার্ট আর মায়া—দু'টি ভাইবোন ওরা।

বাবা-মা হারম্যান আর পলিন আইনস্টাইন। জাতিতে ইহুদি।

ভাইবোনের প্রকৃতি কিন্তু একদম আলাদা। বয়সে বড় অ্যালবার্ট ভারি শান্ত প্রকৃতির। মায়া ভারি দুরন্ত—চঞ্চলতায় ভরা তার দেহ মন। প্রকৃতিতে আলাদা হলে কি হবে ওদের মনের মিল কিন্তু খুব।

ছেলের নির্জীব আর উৎসাহহীন মুখ দেখে বাবার মন ভারি হয়। একমাত্র ছেলে, সে যদি দিন দিন ভাবুক আর উৎসাহহীন হয়ে ওঠে তবে কোন বাবার তা ভাল লাগে! তা' ছাড়া নিজে তিনি খুব কর্মঠ। দারুণ খাটতে পারেন···এবং খাটেন।

সাধারণভাবে ইহুদিরা খুব কাজ পাগল। নিজস্ব জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। সারা বিশ্বে তারা ছড়িয়ে আছে। আইনস্টাইন পরিবারের পুরুষরা পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবসার কাজে ছড়িয়ে রয়েছেন। গড়ে তুলেছেন বড় বড় ব্যবসার সংগঠন। হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছেন। তাঁরা সফল আর নামকরা ব্যবসায়ী।

অ্যালবার্টের বাবা হারম্যান নিজেও একজন ব্যবসায়ী।

মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ করে বলেন—অ্যালবার্টকে দিয়ে কিছুই হবে না দেখছি। ওর যা বুদ্ধির দৌড় তাতে লেখাপড়াও শিখতে পারবে না। ব্যবসা করবে যে তাও পারবে না। অত উৎসাহহীন হলে খাটবে কি করে! একদম অমানুষ হয়ে যাবে!

ছেলের উপর কিন্তু মায়ের দারুণ ভরসা। অ্যালবার্ট বড় ভাবুক। তাই ত ছেলের ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে রঙীন স্বপ্নের জাল বোনেন মা পলিন। বলেন—না না। অ্যালবার্টের জন্য ভেব না। ও অমানুষ হবে না। আমার অ্যালবার্ট অধ্যাপক হবে। কলেজে পড়াবে।

মায়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—ছোটবেলা থেকে যে ছেলে এত ভাবুক বড় হয়ে সে ঠিক অধ্যাপক হবে।

হারম্যান শুধু হাসেন, আর কিছু বলেন না।

মা পলিনের মনে অফুরন্ত ধৈর্য। ছেলের অনেক প্রশ্নের জবাব

তাই মা-কে দিতে হয়। আর সকলে যখন অ্যালবার্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ, নানা মন্তব্যে সোচ্চার—না, অ্যালবার্ট অমানুষ হয়ে যাবে, একটা গবেট, লেখাপড়া ত শিখবেই না, আর ব্যবসা করতেও পারবে না। মায়ের অজস্র স্নেহধারা তখন ছেলের মাথায় ঝরে পড়ে। ভালবাসার করুণাধারায় যেন স্নান করে বালক অ্যালবার্ট।

তাঁর ছেলে একদিন অধ্যাপক হবে, পণ্ডিত হবে, কলেজে পড়াবে।

পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেও নিরীহ ভালমানুষ অ্যালবার্টকে তাঁরা স্নেহ করেন।

মাঝে মাঝে বাবা, মা কিংবা কাকা জেকবের সাথে বালক অ্যালবার্ট বেড়াতে যেত।

শহর ছেড়ে দূরে গ্রামের ছায়া-ঢাকা পথে আপন মনে বেড়াতে ভাল লাগে তার। পাতার জাফরি চুঁইয়ে রোদ পড়েছে লুটিয়ে। রাজ-পথের দুধারে অতি চেনা গাছ-গাছালির জটলা। যতদূর দৃষ্টি যায় হয় সবুজ সবুজ বন আর না হয় ঢেউ খেলানো ফসলের ক্ষেত। ওরই ফাঁকে ছোট ছোট নদী একটানা বয়ে চলেছে সাগরের মুখে। পাখ-পাখালির কিচিরমিচির, মিষ্টি হাওয়া আর নিথর, শান্ত চারধার, খোলা-মেলা পরিবেশ! নিজেকে এমন পরিবেশে হারিয়ে ফেলত অ্যালবার্ট।

আপন মনে কখন একটা সবুজ পাতা ছিঁড়ে নেয় পথের ধারে ঝোপ থেকে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখতে থাকে পাতার আকৃতি··· শিরা-উপশিরা বহুল এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে মন হারিয়ে যায় বুঝি। কখনও বা অ্যালবার্ট অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে হ্রদের অজস্র নিথর জলরাশির দিকে। স্রোত নেই। একটুকরো হাওয়া জলের বুকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢেউ ছুঁয়ে ছুটে যাচ্ছে। ঢেউ উঠছে, ভাঙছে। আবার জল নিথর হচ্ছে। বুদ্‌বুদ্‌ ভাসছে।

আঁধার রাতের তারা-ভরা আকাশ বালক অ্যালবার্টের মনে মহা বিস্ময় সৃষ্টি করে।

বিস্ময়! বিস্ময়! আর বিস্ময়!

নতুন যা দেখে অ্যালবার্ট তাই তার কাছে বিস্ময় বলে মনে হয়। গোটা প্রকৃতির রাজ্যটাই বিস্ময়ে ভরা। আর সেই বিস্ময়ের ছবি ভেসে ওঠে তার মনের আয়নায়। বালকের ছোট মনে কত না নতুন নতুন প্রশ্নেরা ভিড় করে ফুটে ওঠে। অনেক কিছু অজানাকে সে জানতে চায়। অনেক কেন-র জবাব শুনতে চায়। সঠিক জবাব যতক্ষণ না জানতে পারে ততক্ষণ তার বালক মন তৃপ্তি পায় না।

ছোট বোন মায়া তার খেলনাপাতি আর পুতুল নিয়ে খেলা করে, মনের আনন্দে দৌড়-ঝাঁপ করে। আর অ্যালবার্ট কোন ঝোপের আড়ালে চুপচাপ বসে থাকে। দেখে পরিবেশের মাঝে অপার বিস্ময়ের খেলা। পিঁপড়েরা সার বেঁধে চলেছে, তাদের মুখে সংগ্রহ করা খাবারের টুকরো। আর না হয় একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নিরীক্ষণ করে। কখনও কখনও অজানা ভাবনায় ডুবে থাকে তার মন।

শান্ত-শিষ্ট অ্যালবার্ট। ভাবুক মন তার।

মাস্টারমশায়রা ধমক দেন তাকে। সহপাঠীরা তাকে দেখে হাসে, ঠাট্টা করে।

বাবা-মা ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হন। তাঁদের উদ্বিগ্নভাব আরও বাড়ে যখন মাঝে মাঝে অ্যালবার্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ দেহে জ্বরের যন্ত্রণা···কিন্তু অ্যালবার্ট এতটুকু অভিযোগ করে না, কান্নাকাটি করে না। নিরীহ শান্ত বালক আরও শান্তভাবে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকে। ক্লান্তি-ভরা দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে খোলা জানালা দিয়ে বাগানের দিকে। সবুজ পাতার কোলে অজস্র ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে, রোদ পড়েছে ভিজে ঘাসের মাথায়। ক'টা নাম-না-জানা পাখি শিস দিচ্ছে মিষ্টি সুরে। বাবা-মা ছেলের রোগ সারাবার ওষুধের ব্যবস্থা করেন। অ্যালবার্ট সেরে ওঠে। কিন্তু দেহের ক্লান্তি, মনের ভাবুক ভাব সারাবার ওষুধ কোথায়? ছেলেকে উৎফুল্ল রাখবার, কর্ম-চঞ্চল করে তোলার কোনও পথই তাঁরা খুঁজে পান না।

হারম্যান আইনস্টাইনের ছিল বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা। কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে মিউনিখ শহরে তিনি নাম করা ব্যবসাদার হয়ে ওঠেন। অ্যালবার্ট তাঁর একমাত্র ছেলে। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর ছেলে খুব পরিশ্রমী হবে এবং ব্যবসা করে খুব ধনী হবে। তাই ছেলের মন উৎফুল্ল করে তোলার, ব্যবসার দিকে আকর্ষণ করার তিনি চেষ্টা করতেন।

একদিন হারম্যান শহরের একটা দোকানে একটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (কম্পাস) দেখে কিনে ফেললেন সেটা। যন্ত্রটা নিয়ে অ্যালবার্ট খেলা করবে। হয়ত যন্ত্রটার অভিনব কলাকৌশল দেখে তার অসুস্থ মনে আনন্দের জোয়ার আসবে।

—দেখ অ্যালবার্ট, যন্ত্রটা কি সুন্দর! বাক্সটা তুমি যেদিকে খুশি ঘোরাও, কিন্তু যন্ত্রের কাঁটাটা স্থির হলে কেবল একটা নির্দিষ্ট দিক দেখিয়ে দেবে। যন্ত্রের কাঁটা কখনো ভুল করবে না।

হারম্যান ছেলের মন যন্ত্রটার দিকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন।

দিগদর্শন যন্ত্রটা হাতের তালুর ওপর রাখল অ্যালবার্ট, এদিক ওদিক ঘোরালো। তির তির করে কাঁপতে কাঁপতে থামল যন্ত্রটার কাঁটা এবং সব সময় একটা দিক দেখিয়ে দিল। আবার নাড়ল যন্ত্রটা…কাঁটাটা নড়ল। আবার থামল।

অ্যালবার্ট জিজ্ঞাসা করল—বাবা, কাঁটাটা একটা নির্দিষ্ট দিক দেখাচ্ছে কেন?

—পৃথিবীর চুম্বকশক্তি কাঁটাটাকে আকর্ষণ করছে, তাই।

চুম্বক কি? বালক অ্যালবার্ট বুঝতে পারল না। তাই আবার শুধাল—সেটা আবার কি জিনিস, বাবা?

—আমাদের এই পৃথিবীর একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন চুম্বক। তুমি খেলা করো ওটা নিয়ে।

অ্যালবার্ট তবু শান্ত হয় না। তার মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন মাথা কুটছে। সে সঠিক জবাব শুনতে চায়। তাই আবার বলল—আচ্ছা বাবা, কাঁটাটা একটাই দিক দেখাচ্ছে কেন?

হারম্যান ব্যবসায়ী মানুষ। বিজ্ঞানের চুলচেরা জ্ঞান তাঁর নেই। বললেন—তোমার কাকা জেকবকে জিজ্ঞাসা কর, সে সব বুঝিয়ে দিতে পারবে।

জেকব আইনস্টাইন অ্যালবার্টের কাকা। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। বালক ভাইপোর অনেক কেন-র জবাব তাঁকে দিতে হয়। সব বিষয় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

অ্যালবার্ট বার বার দিগদর্শন যন্ত্রের বাক্সটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতে লাগল। আর কি অবাক কাণ্ড! প্রতি বার এক অদৃশ্য শক্তি কাঁটাটাকে এক বিশেষ দিক নির্দেশ করতে বাধ্য করছে। না, একবারও ভুল হচ্ছে না। ঘুরেফিরে নড়েচড়ে কাঁটা ঠিক একই দিকে মুখ করে থেমে যাচ্ছে। কে এই শক্তিধর? কাকার কাছে অ্যালবার্ট শুনেছে যে ওই সীমাহীন আকাশ, যাকে মহাশূন্য (স্পেস) বলি, তা একদম ফাঁকা। তাই যদি সত্য হয়, তবে কার টানে এই কাঁটা দিক নির্ণয় করছে? এবং কেন সে আড়ালে থাকছে? তার হাত কেন দেখতে পাচ্ছে না অ্যালবার্ট?

তাহলে এই মহাশূন্য ত শূন্য নয়। একজন, এক মহাশক্তিধর এই মহাশূন্যে বিরাজ করছে। কাঁটার গতিকে সে নিয়ন্ত্রণ করছে। তার আকর্ষণ আছে ঠিকই, কিন্তু সে থাকে আড়ালে। কোথায়? এই মাটির পৃথিবীর বুকে? বাবার কাছে শুনেছে, এই গোটা পৃথিবীটা একটা চুম্বক। তাকে দেখতে পাচ্ছে না অ্যালবার্ট··· কিন্তু তার শক্তির আকর্ষণ নজরে পড়ছে। কাঁটাটা তারই হাতের পুতুল।

বিজ্ঞান জগতে প্রবেশ করবার সর্ব প্রথমের দরজাটা সেদিন সেই মুহূর্তে খুলে গেল বালক অ্যালবার্টের সামনে। শান্ত বালক আরও শান্ত মনে ভাবতে লাগল। ঘুম নেই তার চোখে, নেই দেহে ক্লান্তির চিহ্ন। অ্যালবার্ট বিজ্ঞান জগতের মহাবিস্ময়ের কথা ভাবতে লাগল! আর অপার আনন্দে ভরে উঠল তার বালক মন।

দুই

রঙ, তুলি আর ক্যানভাস নিয়ে ছবি আঁকে শিল্পী। কিন্তু ছবি আঁকার আগে শিল্পীকে ঠিক করতে হয় কি হবে ছবির পটভূমি। কেননা এই পটভূমির বুকে ধীরে ধীরে শিল্পীর হাতের তুলির টানে ছবির রঙ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবনও এমনি, যেন শিল্পীর আঁকা ছবি আর ছবির পটভূমি হচ্ছে তার সমাজ, তার পরিবেশ। কেননা পরিবেশ মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তার সমস্ত জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে। মানব জীবনের উন্নতি অবনতি সব কিছু নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবন পুরোপুরিভাবে জানতে হলে তখনকার ইউরোপের বিশেষ করে জার্মানীর অবস্থা জানা প্রয়োজন। অজস্র ছোট বড় রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল তখনকার গোটা ইউরোপ মহাদেশ। জার্মানী ছিল ইউরোপের অন্যতম শক্তিধর রাজ্য।

উল্‌ম্‌ জার্মানীর একটা ছোট শহর মিউনিখ থেকে পঁচাশি মাইল পশ্চিমে। আঠার শ' উনআশি সালের চৌদ্দই মার্চ এই শহরে অ্যালবার্টের জন্ম হয়।

জার্মানীর এই দক্ষিণ অংশের নাম তখন ছিল ব্যাভেরিয়া। আর উত্তর অংশের নাম ছিল প্রুশিয়া। ব্যাভেরিয়া ছিল স্বাধীন একটা রাজ্য। একজন রাজা রাজত্ব করতেন এখানে। রাজ্যটি ছিল খুবই দুর্বল। ইউরোপের অনেক রাজ্যের নজর ছিল ব্যাভেরিয়ার উপর। এটিকে দখল করে নিজেদের রাজ্যের সীমা বাড়াবার ইচ্ছা ছিল অনেকের। ফলে মাঝে মাঝে রাজ্যগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। আবার উত্তর দিকের প্রুশিয়া রাজ্যটি ছিল খুবই শক্তিশালী। এই রাজ্যটির রাজনৈতিক নেতা ছিলেন অটো-ভন-বিসমার্ক। তিনি ছিলেন জার্মানীর লৌহ-দৃঢ়-মন রাজনীতিক। দুই জার্মানীকে এক করে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাজ্য গঠনের জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন।

সুযোগ এসে গেল।

অ্যালবার্টের জন্মের কয়েক বছর আগে—ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের পতন ঘটল। তার স্বাধীনতা লোপ পেল। ব্যাভেরিয়া আর প্রুশিয়ার মিলনে গড়ে উঠল নবীন জার্মান সাম্রাজ্য।

প্রুশিয়ার অধিবাসীরা ছিল খুব শৃঙ্খলা-পরায়ণ। শৃঙ্খলা, বাধ্যতা এবং আদেশ পালনে তৎপরতা এই ছিল প্রুশিয়ার যুবকদের জীবনের আদর্শ। তারা তাই দেশের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিত। ব্যাভেরিয়াবাসীরা ছিল অলস আর আরামপ্রিয়।

বিসমার্ক সচেষ্ট হলেন ব্যাভেরিয়াবাসীদের জীবনের ধারা বদলে দেওয়ার জন্যে। স্কুল জীবন থেকেই যাতে তারা কঠোর সৈনিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে তাই গোটা জার্মানীর উত্তরাঞ্চলের মতন দক্ষিণ অঞ্চলের স্কুলগুলিতে সামরিক শিক্ষার প্রচলন হল। সৈনিকদের পালনীয় নিয়মগুলো যাতে ছাত্রেরা আয়ত্ত করতে পারে তাই শিক্ষার ধারা গেল বদলে। শৃঙ্খলা, বাধ্যতা আর আদেশ পালনে তৎপরতা হল স্কুলের শিক্ষার প্রধান ও মূল আদর্শ।

তাই স্কুল নয় ত, তৈরি হল এক একটা সৈনিক ছাউনি।

আর মাস্টারমশায়রা হলেন এক একজন লড়াইয়ের সেনানায়ক।

অ্যালবার্টের জন্মের পর তার বাবা হারম্যান আইনস্টাইন ছোট্ট শহর উল্‌ম্ ছেড়ে চলে আসেন মিউনিখে। শুরু করেন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবসা।

অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হল।

শুরু হল শান্তশিষ্ট বালকটির স্কুল জীবনের দুর্ভোগ। শৃঙ্খলা-পরায়ণ হয়ে ওঠাই সব শ্রেণীর প্রথম পাঠ। সবাই শিখবে কঠোর শৃঙ্খলা। শোনামাত্র হুকুম পালন করার পাঠ নিতে হবে!

মাস্টারমশায়রাও সবাই সৈনিক। তাঁদের নজর ছিল, ছাত্ররা যেন বাধ্য হয়ে ওঠে। চালাক হয়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে

তারা যেন জবাব দিতে পারে। দেরী করার অর্থ অবাধ্যতা। ঢিলেমি এবং গড়িমসি স্বভাব শৃঙ্খলাবোধের বিরোধী।

কিন্তু বালক বয়সেই অ্যালবার্টের মাথায় ভিন্ন ধারণা ঢুকেছিল। প্রশ্নের জবাব সে সঠিক দেবে। সঠিক জবাব জানা না থাকলে সে কোনও কথাই বলবে না। আর তাই সঠিক জবাব মনে করতে চেষ্টা করে। কোনও রকমে একটা জবাব দিয়ে শাস্তি এড়াবার ইচ্ছা তার হয় না।

সৈনিক মাস্টারমশায় যখন কঠোর কণ্ঠে বলেন—কই, জবাব দাও ?

নীরব অ্যালবার্ট। সে জবাব খুঁজছে তখন মনে মনে।

কাজেই স্কুল-জীবনে তাকে বহু পীড়ন সহ্য করতে হয়।

প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ অ্যালবার্টের। এবার সে ভর্তি হল প্রারম্ভিক স্কুলে। লুইটপোল্ড জিমন্যাসিয়াম···মিউনিখের নামকরা প্রারম্ভিক স্কুল। উত্তর জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে হলে প্রয়োজন প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা।

হারম্যান এবং পলিন ভেবেছিলেন, বালক অ্যালবার্ট এখন বড় হয়েছে। বড় স্কুলে পড়ছে। হয়ত এবার সে চালাক হবে। তাড়াতাড়ি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। স্কুলে আর পীড়ন সহ্য করতে হবে না।

কিন্তু মা-বাবার মনের আশা পুরল না।

প্রারম্ভিক বিদ্যালয়েও অ্যালবার্ট কিছুদিনের মধ্যেই ধীর-স্বভাব ও মেধাহীন ছাত্র বলে পরিচিত হল।

উত্তর জীবনের কথা মানুষ যদি আগে থেকে কল্পনা করতে পারত তাহলে অনেকেই জীবনে পীড়ন ভোগ করার হাত থেকে বেঁচে যেত। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ব্যাপারে এ কথা বলা যায়। বালক অ্যালবার্ট স্কুলে এবং বাড়িতে শান্ত ও লাজুক স্বভাবের জন্যে বোকা বলে চিহ্নিত হয়েছিল। সবাই তাকে মোটাবুদ্ধির বালক মনে করে উপহাস করত।

কিন্তু স্কুলের মাস্টারমশায় ও সহপাঠীরা এবং পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা যদি সেদিন ধারণা করতে পারত যে, এই নিরীহ

বালক একদিন বিশ্বের সবসেরা পদার্থ-বিজ্ঞানী হবেন, তাহলে কখনও তারা তাকে ওভাবে উপহাস করত না।

অ্যালবার্ট শান্ত-স্বভাব আর ভাবুক বালক। বোকা কিংবা অসামাজিক নয়। সকলের কাছ থেকে দূরে নির্জনে কোনও না কোন বিষয় নিয়ে ভাবনায় ডুবে থাকতে ভালবাসত অ্যালবার্ট।

প্রারম্ভিক স্কুলেও ছেলের স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হল না দেখে হারম্যান আরও হতাশ হলেন।

—পলিন, আমার ভাগ্যই খারাপ। এদিকে ব্যবসার অবস্থা সঙ্গীন, ওদিকে ছেলেটাও মানুষ হল না। বললেন হারম্যান।

ছেলের সম্বন্ধে মায়ের মনের আশা কিন্তু এতটুকু কমে নি। শান্ত-স্বভাব অ্যালবার্ট একদিন পণ্ডিত হবে।

স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষাক্রম আর ভাল লাগছিল না অ্যালবার্টের। দৈনন্দিন পড়াশুনো কেমন যেন একঘেয়েমিতে ভরা। কোনও মিল নেই, আবার নেই কোনও বৈচিত্র্য। বালক মনকে আকর্ষণ করার মতন নূতনত্ব নেই। স্কুলের প্রতি তাই সে দিনে দিনে বিরূপ হয়ে উঠছিল।

শিক্ষাক্রমে ছিল, সব ছাত্রকে ল্যাটিন এবং গ্রীক শিখতে হবে। কিন্তু এ দু'টোই ত বিদেশী ভাষা, নিরস···নিরানন্দ। ব্যাকরণ মুখস্থ করে এই দু'টো ভাষা সে কিছুতে আয়ত্ত করতে পারছিল না। আর ব্যাকরণের সূত্রগুলো মুখস্থ করে বারবার লেখবার ধৈর্যও তার ছিল না। অথচ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মাস্টারমশায়রা তার উপর চাপ দিচ্ছিলেন। এই দু' দু'টো বিদেশী ভাষা শিক্ষা করলে কি লাভ হবে তার ? উত্তর জীবনে তার কোন কাজে লাগবে ? অথচ প্রতিবাদ করার উপায় নেই। আর প্রতিবাদ করলে শুনবেই বা কে ? অ্যালবার্টের মনের বিরূপতা তাই দিন দিন বাড়ছিল।

ইতিহাস শিক্ষাক্রমের আর একটা বিষয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে কত ঘটনা ঘটেছে। উত্থান-পতন হয়েছে কত রাজ-রাজড়ার, কত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। জয়-পরাজয়ের সুদীর্ঘ তালিকা লেখা আছে

ইতিহাসের পাতায় পাতায়। লেখা আছে যাযাবর হুন-নায়ক এটিলার কাহিনী, তার বাহিনীর হাতে কত নগর কত গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে আলেকজাণ্ডার, শার্লামেন আর জুলিয়াস সীজারের ইতিবৃত্ত। সাল, তারিখ আর বংশতালিকা ইতিহাসের অতীত কাহিনীর পাতা থেকে এসব মুখস্থ করতে হবে। ইতিহাস পড়তেও তার ভাল লাগে না। কেন বাপু, এসব খুঁটিনাটি বিষয় ত ছাপার অক্ষরে ইতিহাসে লেখাই আছে তবে আর সে-সব মুখস্ত করার কি দরকার।

ক্লাসে ইতিহাস বা ব্যাকরণ যখন পড়ানো হত তখন অ্যালবার্টের মনে নানা প্রশ্ন জাগত।

সে বারবার মাস্টারমশায়দের কাছে সে-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত।

এটা কেন? কেন হল এরকম? ওটা এরকম হল না কেন?

এত প্রশ্নের জবাব জানা নেই মাস্টারমশায়ের। তিনি বিরক্ত হতেন। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত। গর্জে উঠতেন তিনি—থাম অ্যালবার্ট। রাখ তোমার 'কেন'!

তাছাড়া অ্যালবার্ট এমন সব প্রশ্ন করত যার কোন জবাব নেই। আর থাকলেও তা' মাস্টারমশায়ের জানা নেই। কাজেই তিনি ছাত্রকে ধমক দিতেন।

শুধু জেকব কাকার মনে ছিল অফুরন্ত ধৈর্য আর স্নেহ।

বালক ভাইপোর সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

—বীজগণিত কি কাকা? অ্যালবার্ট একদিন শুধাল।

—অ্যালবার্টল্ এই বীজগণিত এক অদ্ভুত বিষয়। ধর, তুই আর আমি জঙ্গলে ঢুকে একটা ছোট্ট জন্তু শিকার করার চেষ্টা করছি। জন্তুটার নাম আমাদের অজানা তাই সুবিধার জন্য নাম রাখা হল একস্। তারপর আমরা জন্তুটা শিকার করলাম। তার মানে তাকে হাতে পাওয়া গেল। তখন তার সঠিক নাম দেওয়া হল।

অ্যালবার্টের কাছে বীজগণিত এবার খুব সহজ মনে হল। 'একস্'..অর্থাৎ যাকে আমি জানি না অথচ যাকে পাওয়ার জন্যে,

খোঁজার জন্যে চেষ্টা করছি সে, এবং যখন তাকে হাতে পেলাম তখন আর সে অজানা রইল না। তার নামও জানা গেল। অবাক হল অ্যালবার্ট! বীজগণিত এত সোজা! এবং একবার যখন বীজগণিতের রহস্য তার কাছে ধরা পড়ল তখন অতি সহজে বীজগণিতের অঙ্ক নির্ভুলভাবে কষতে শুরু করল।

স্কুলের অন্যান্য ছাত্রেরা যখন বীজগণিতের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল অ্যালবার্ট তখন বীজগণিতের বহু অধ্যায়ের অঙ্ক কষে ফেলেছে। বীজগণিতের অঙ্ক কষে সে অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করছিল। এমনিভাবে একদিন অ্যালবার্ট বুঝতে পারল যে, অসীম জ্ঞানরাজ্যে যদি প্রবেশ করতে হয় তবে বই পড়তে হবে। বই পড়ার মধ্যে লাভ করা যায় অফুরন্ত আনন্দ।

—তোর বই পড়তে বুঝি ভাল লাগে না? কেন বল ত অ্যালবার্ট্‌ল্? জানতে চাইলেন জেক কাকা।

—স্কুলের বই পড়তে ভাল লাগে না। কি হবে ওসব পড়ে?

—না পড়লে শিখবি কি করে? বড় বড় পণ্ডিতরা বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেছেন, লিখেছেন তাঁদের বইতে। গ্যালিলিও, ইউক্লিড, কোপারনিকাস, ল্যাভয়সিয়র, স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁদের গবেষণার কথা বইতে লিখেছেন। তোর সে-সব বই পড়তে ইচ্ছে হয় না, অ্যালবার্ট্‌ল্?

—বিজ্ঞানের বই আমাকে এনে দিও, কাকা। আমি পড়ব।

জেকব আইনস্টাইন ভাইপোকে বিজ্ঞানের নানা বই এনে দিলেন।

সে সব বই পড়ল অ্যালবার্ট। যেখানটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না সেখানটা ভাইপোকে বুঝিয়ে দিলেন জেকব। জান, আমাদের এই পৃথিবীটা একটা নিয়মের রাজত্ব। এখানে বেনিয়মে কোনও ঘটনা ঘটে না। বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর এসব নিয়ম গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা এ সব সত্য আবিষ্কার করে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য সাধনা করছেন। পৃথিবী অহরহ ঘুরছে। ঘুরছে আপন মেরুদণ্ডের

উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্যেরও চারধারে। এই ঘোরার জন্যে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে। পৃথিবী সেই কক্ষপথ ধরে ঘোরে। কোনও দিন একটি মুহূর্তের জন্যও পৃথিবী নিজের কক্ষপথ থেকে সরে যায় না। আবার পৃথিবী শুধু ঘুরছে না, তার বুকে সব বস্তুকে সে আকর্ষণ করছে। তাই ত মানুষ, জন্তু-জানোয়ার-গাছ-গাছালি-পাখ-পাখালি কেউ ঘোরার বেগে ছিটকে পড়ছে না। দিন ফুরিয়ে রাত হচ্ছে, আবার রাত শেষে হচ্ছে দিন। সব কিছুই চলছে নিয়মমাফিক।

সূর্য সৌরমণ্ডলের শক্তির উৎস। সেই শক্তি পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তা সে বস্তু জড়ই হোক কি গতিশীল হোক। বস্তুকণার ধর্ম, তার গুণ, তার গঠন...সবই হচ্ছে নিয়ম-মাফিক। কোথাও ব্যতিক্রম নজরে পড়বে না। জীব-জগতও চলছে নিয়মের শাসনে। জন্ম, বৃদ্ধি আর ধ্বংস কোথাও ব্যতিক্রম নেই; নেই বিচ্যুতি। শৃঙ্খলা প্রকৃতির রাজ্যে যেন প্রাথমিক অলিখিত নিয়ম।

অ্যালবার্ট একের পর এক বিজ্ঞানের বই পড়ছে আর জানছে বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের কাহিনী···বিশ্বরহস্য। বই পড়ার ফলেই জ্ঞানরাজ্যের সদর দরজাটা তার সামনে খুলে গেল। আর ধীরে ধীরে লাজুক মুখে সে দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল জ্ঞান-রাজ্যে।

প্রাথমিক স্কুলে শব্দের পর শব্দ যোগ করা শিখতে অ্যালবার্টকে বহু বেগ পেতে হচ্ছিল। হোঁচট খাচ্ছিল পদে পদে। কিন্তু প্রারম্ভিক স্কুলে অ্যালবার্ট বুঝতে পারল যে, মাত্র কয়েকটা অক্ষর যোগ করলে একটা শব্দ হয় না, সব শব্দের সঙ্গে একটা অর্থ জড়িয়ে আছে। কয়েকটা শব্দ ঠিকমত সাজাতে পারলে যে একটা বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় সে রহস্য ধরতে পারল। জানল কেমন ভাবে সৃষ্টি হয় সুরেলা ছন্দময় কবিতার প্রতিটি লাইন। গ্যেটে, শিলার তখন আর তার কাছে অজানা মনে হয় না। যা জানবার জন্য তার মন সব সময় অধীর সেসব প্রশ্নের জবাব এখন যেন আপনা থেকে সে পেয়ে যায়। শব্দের পর শব্দ

গেঁথেই ত সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞানরাজ্যের প্রাসাদ। অ্যালবার্টের মুঠোয় সেই দেউড়ির চাবিকাঠি।

কাকে আর ভয় করবে অ্যালবার্ট?

তাই গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তে লাগল সে।

সব চেয়ে তার ভাল লাগল বার্নস্টেনের বইগুলো। প্রাণী আর উদ্ভিদ জগৎ নিয়ে সহজ বিজ্ঞানের বই লিখেছেন তিনি। পড়তে পড়তে নিজেকে হারিয়ে ফেলল অ্যালবার্ট। অজস্র প্রাণী আর উদ্ভিদের বাসভূমি এই জানা-অজানা পৃথিবী। বিশাল মহাসমুদ্রের নীচেও রয়েছে কত না প্রাণী, কত না উদ্ভিদ! তাদের জীবন রহস্য কি বিচিত্র!

প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে উঁচুক্লাসে উঠবার পর অ্যালবার্টের হাতে জ্যামিতির একখানা বই পড়ল। ওখানা তার পাঠ্যপুস্তক। এখন জ্ঞানরাজ্যের অনেক কিছু আয়ত্ত করতে পেরেছে অ্যালবার্ট। তাই দু'সপ্তাহে জ্যামিতি পড়ে তার প্রব্লেমগুলো সঠিকভাবে সমাধান করতে পারল। সেদিন জ্যামিতি তাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।

অ্যালবার্টের কাছে আর একটা আনন্দের জিনিস ছিল তার বেহালা।

কাঁধের উপর বেহালা রেখে তারের বুকে ছড় টানলে সৃষ্টি হয় সুরের মায়াজাল। বহু সুরের মিলনে সঙ্গীত। অল্পবয়সেই বিখ্যাত সুর-স্রস্টাদের সুরের সঙ্গে অ্যালবার্টের নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

পলিন গান-বাজনা ভালবাসতেন। প্রত্যেক সপ্তাহে আইনস্টাইনদের বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসত।

বড়রা গান-বাজনায় যোগ দিতেন। ছোটদের সেখানে বসে গান-বাজনা শোনার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু অ্যালবার্ট টেবিলের নীচে লুকিয়ে বসে গান-বাজনা শুনত। এবং সুরসাগরে ডুব দিত।

অ্যালবার্টের বয়স বছর ছয়েক।

ছেলের গান-বাজনার দিকে মন আছে দেখে মায়ের মন খুশি হল।

—অ্যালবার্ট্‌ল্‌, গান খুব ভালবাসিস, তাই না ?

শান্ত ছেলের মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

মা নিজের বেহালাখানা। ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—চল, তোকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসি।

গান…এ আর এক ভিন্ন জগৎ !

কিন্তু বেহালার মধ্য থেকে সুরের সৃষ্টি করতে হলেও অনুশীলন করা প্রয়োজন। অপরের সৃষ্ট সুর শোনা আর নিজে সুর সৃষ্টি করার মধ্যেও আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। বার বার একই গৎ বাজিয়ে হাত ঠিক করতে হয়। তার জন্যে ধৈর্য প্রয়োজন।

বালক অ্যালবার্টের মনে ধৈর্যের বড় অভাব।

প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে রোজকার পড়াশুনার ব্যাপারেও একই হাল হল।

পড়াশুনায় মন নেই। বার বার হোঁচট খাচ্ছে। মাস্টার মশাইয়ের জবাব দিতে দেরি হচ্ছে। সেই বোকা বোকা ভাব। সবাই তাকে উপহাস করছে। তাই সেদিন তার অবস্থা দেখে কেউ ধারণা করতে পারে নি যে, এই ছেলে একদিন বিজ্ঞানে জগৎ-জোড়া নাম কিনবে।

অ্যালবার্ট সবচেয়ে খুশি হত যেদিন অধ্যাপক রুস পড়াতে আসতেন।

ধ্রুপদীয় সাহিত্য পড়াতেন তিনি। হোমর, ভার্জিল, গ্যেটে, শিলারের কাব্য পড়াতে পড়াতে অধ্যাপক যেন অন্য জগতে চলে যেতেন। এত কেবল পড়ানো নয় যেন শিল্পী তাঁর পড়ানো বিষয় আর কাহিনীর ছবি আঁকছেন। আর সেই ছবির চিরন্তন রূপ ফুটে উঠছে এক কিশোর ছাত্রের মনের পটে।

অধ্যাপক রুস অ্যালবার্টের মনে বই-পড়ার ইচ্ছাকে আরও তীব্র করে তোলেন।

তাই অধ্যাপক রুসকে জীবনে ভুলতে পারে নি অ্যালবার্ট।

উত্তর জীবনে এই অধ্যাপক সম্পর্কে অ্যালবার্ট বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।

সে সময় অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বিজ্ঞানী। সেরা বিজ্ঞানীদের একজন। ধীরে ধীরে খ্যাতির শিখরে উঠছেন। মিউনিকে এসেছেন বহুদিন পরে। আসার পর অ্যালবার্ট ভাবলেন, অধ্যাপক রুসের সঙ্গে দেখা করবেন। বলবেন আপনাকে আমি ভুলি নি স্যার! আপনার স্মৃতি আজও আমার মনে আছে।

এক সকালে অ্যালবার্ট অধ্যাপকের বাসায় হাজির হলেন। দরজার কলিঙ বেল টিপলেন। অধ্যাপক রুস নিজেই দরজা খুলে দিলেন।

একজন অপরিচিত যুবককে বাড়ীর দরজায় দেখে তাঁর মনে সন্দেহ ঘনিয়ে এল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। কে এই যুবক? একে কখনও দেখেছেন বলে ত মনে পড়ছে না!

অ্যালবার্ট তখনও বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অধ্যাপককে ঠিক চিনতে পেরেছেন। চেহারা প্রায় একই রকম রয়েছে। শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে। দারুণ খুশি হলেন অ্যালবার্ট।

বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন, স্যার! আপনার ছাত্র ছিলাম।

তবু হাসি হাসি মুখ যুবককে চিনতে পারলেন না অধ্যাপক। বরং তাঁর মনে সন্দেহ দানা বাঁধল। যুবক হয়ত তাঁর কাছে ধার চাইতে এসেছে! তিনি সোজা দরজা বন্ধ করে দিলেন মুখের উপর।

আনন্দিত অ্যালবার্ট দুঃখিত হলেন। লজ্জায় ক্ষোভে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তিনি ফিরে এলেন।

তিন

প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের সেটা শেষ বছর।

নিরানন্দ স্কুল জীবন এবার শেষ হবে। এখান থেকে ডিপ্লোমা পেলেই অ্যালবার্ট কলেজে ভর্তি হতে পারবে। জীবনের পরিসীমা

তখন আরও বড় হবে। অনেক অনেক বই পড়বার সুযোগ সে পাবে।

কিশোর অ্যালবার্ট তাই খুশি।

এমন দিনে আইনস্টাইন পরিবারে দুর্ভাগ্যের ছায়া পড়ল।

হারম্যানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানে হল লোকসান। পাওনা-দারের দেনা শোধ করে দিতে হলে দোকান চালানো সম্ভব নয়। দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।

—কি করি বলো ত? হারম্যান খাওয়ায় টেবিলে স্ত্রীকে বললেন।

—কি হয়েছে?

—বাজারের অবস্থা খুব খারাপ। অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। পাওনাদাররা টাকার জন্যে খুব তাগাদা দিচ্ছে। ওদের টাকা দিতে হলে দোকান তুলে দিতে হবে।

—কি করবে তাহলে?

—ভাবছি, এখানকার দোকান বন্ধ করে ইটালির মিলান শহরে চলে যাব।

মিলানে হারম্যানের এক কাকা থাকেন। তিনি এবং তাঁর ছেলেরা সেখানে ব্যবসা করেন। নিজের এখানকার অবস্থা জানিয়ে কাকাকে চিঠি লিখেছিলেন হারম্যান। সেই চিঠির জবাব এসেছে: মিলান বড় শহর। চলে এস এখানে। নতুন করে ব্যবসা গড়ে তুলতে পারবে। আমরাও সাধ্যমত চেষ্টা করব।

হারম্যান তাই মনে মনে ঠিক করেছেন, বাড়ীঘর দোকান সব বিক্রী করে পাওনাদারদের দেনা মিটিয়ে মিলানে চলে যাবেন। ইহুদিদের নিজস্ব জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। ইউরোপে সব রাজ্যে ইহুদিরা ছড়িয়ে আছে। তাই যে ইহুদি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে সেটাই তার জন্মভূমি···তারা যেন যাযাবর।

পলিন শুধালেন—কিন্তু অ্যালবার্টের কি হবে?

—কেন? যেমন পড়াশুনা করছে, করবে।

—এইত সবে ওর পনের বছর বয়স, পড়ছে এখানে, প্রারম্ভিক

স্কুলে এটাই ওর শেষে বছর। স্কুল থেকে ওর ডিপ্লোমা পাওয়া দরকার। নইলে ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাবে না, অ্যালবার্টের মা ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন ।

ছেলের কথাও ভেবেছেন হারম্যান। এ সময় অ্যালবার্টকে স্কুল ছাড়িয়ে কোথাও নিয়ে গেলে ওর ক্ষতি হবে। মাবা-র এখনও বয়স কম, এই পরিবর্তনে ওর লেখাপড়ার তত ক্ষতি হবে না। কিন্তু অ্যালবার্টকে নিয়ে কি করা যাবে ? জার্মান ভাষায় সে পড়াশুনা শেখে স্কুলের উচু ক্লাসে, এখন ওকে মিলান শহরে সরিয়ে নিয়ে গেলে ওকে ইটালিয়ান ভাষা শিখতে হবে। একটা নতুন ভাষা শেখার পর কি সে এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে! এমনিতেই ত সে স্কুলে লেখাপড়া মন দিয়ে করতে পারছে না। পরীক্ষার ফলাফলও খুব ভাল নয়। এ সময় অ্যালবার্টকে সরিয়ে নিয়ে গেলে ওর লেখাপড়া হয় ত বন্ধ হয়ে যাবে।

—অ্যালবার্টের পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে থাকতে পারি না ? শ্রীমতী আইনস্টাইন শুধালেন।

হারম্যান নিজেও সব বোঝেন। কিন্তু করবার ত কিছু নেই। মিউনিক এবার ছেড়ে যেতে হবে। দোকান আর চালানো যাবে না। পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে হাতে সামান্য অর্থ থাকবে। সেই সম্বল নিয়ে মিউনিকে থাকা যায় না।

—আমরা ওকে নিয়ে যাব পলিন। ওখানে স্কুলে ভর্তি করে দেব।

মায়ের ইচ্ছে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এটাও বোঝেন যে, তার ফল ভাল হবে না। ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। তাই মায়ের ইচ্ছের চেয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ বড় হল। শ্রীমতী আইনস্টাইন বললেন—ওকে আমরা এখানে রেখে যাব !

—এখানে রেখে যাবে ?

—হাঁ। এখানে থাকবে। এবং স্নাতক হয়ে মিলানে যাবে। তাই হল। মা-বাবার সঙ্গ ছেড়ে অ্যালবার্ট মিউনিকের একটা বোর্ডিং হাউসে স্থান নিল। এখানে থেকেই সে প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের শেষ

পরীক্ষা দেবে। পার হল কয়েকটা মাস।

মা-বাবা-বোন মিলানে চলে গেছে। অ্যালবার্ট এখন একা। স্কুলটাকে তাই আরও বিশ্রী লাগছিল। দিন দিন ওর মন বিষণ্ন হয়ে উঠতে লাগল। শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও খারাপ হল। অ্যালবার্টের মনে অজানাকে জানবার ইচ্ছা আরও দুর্বার হয়ে উঠল।

কাকাও চলে গেছেন। কে কিশোরের নানা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

একদিন প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত একজন মাস্টারমশাই ধমক দিলেন।

—থাম অ্যালবার্ট। তোমার প্রশ্ন থামাও, অত প্রশ্নের জবাব আমি কি করে জানব! কোথায় বা পাব অত জবাব!

অ্যালবার্ট বোকার মতন উত্তেজিত মাস্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তিনি আবার বলেন তোমার জন্যে অন্য ছেলেরা আমার উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে। তুমি বরং স্কুল ছেড়ে দাও!

স্কুলটা একটা দয়াহীন জেলখানা যেন!

বছর শেষ হল না। অ্যালবার্ট অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়ল। স্কুল জীবনের চরম আঘাত লাভ করলো। এরকম দেহ মন নিয়ে পড়াশুনা করা যায় না।

তাই একদিন ছুটি নিয়ে স্কুল ছেড়ে অ্যালবার্ট গাড়ী চাপল।

ও মিলানে বাবা-মার কাছে যাবে। ওর মন অধীর হয়ে উঠেছে।

রোদ ঝলমল সুন্দরী ইটালি। নীল আকাশের পটভূমি, কোথাও এতটুকু মেঘের কালিমা নেই। সোনালি রোদ ঝরছে। প্রথম দেখার ক্ষণ থেকেই গোটা দেশটা ভাল লাগল অ্যালবার্টের।

ধীরে ধীরে মিউনিকের দুঃখদিনের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এল।

ছেলেকে কাছে পেয়ে মা পলিন খুশি হলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এ' ক'মাসে অ্যালবার্ট বড় রোগা হয়েছে, মুখের রঙ কেমন ফ্যাকাসে হয়েছে,

আরও ভারি হয়েছে স্বাভাবিক আয়ত দু'টি চোখের পাতাগুলো। ওর দু'চোখ কেমন যেন ঢাকা পড়ে আসছে। গভীর ক্লান্তি নেমেছে ওর দেহ-মনে।

মা ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—অ্যালবার্ট্ল্ বড় রোগা হয়েছিস ত! যাক বাড়ি যখন এসেছিস তখন আর ভাবনা নেই। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'! আজ রাতে কি খাবি বল ত?

বাড়ির সেই উষ্ণ ভালবাসা, আর উপছানো দরদ ভরা অনুভূতি। ভাল লাগল অ্যালবার্টের।

বলল—হ্যামিঙ পাখির ডিম আর মদের চাটনি খাব মা!

পলিন খুব আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, ছেলেকে এখন বেশ ভারি ভারি জার্মাণ খাবার দিতে হবে। তাছাড়া ওর দেহের দ্রুত উন্নতির জন্য দিতে হবে পুষ্টিকর খাদ্য। এসব দিকে মায়ের খুব সজাগ দৃষ্টি।

ঘরে ফিরে এসে এই আনন্দঘন পরিবেশের স্বাদে অ্যালবার্টের মন কানায় কানায় ভরে উঠল। শান্ত মনে অ্যালবার্ট পরিবারের সকলের স্নেহ ভালবাসার উত্তাপ উপভোগ করতে লাগল। কিন্তু আনন্দে চঞ্চল হল না। শান্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ মন।

অ্যালবার্টের বাবা ও কাকা কাজের লোক। কাজ তাঁরা ভালবাসেন। অজস্র খেটে নতুন জায়গায় তাঁরা ব্যবসা আবার গড়ে তুলেছেন। অ্যালবার্টের দেহ-মনের এই নির্জীব ভাব তাঁদের কাছে বিশ্রী লাগে। ছেলেটি বড় চাপা স্বভাবের।

ছেলের মনে হয় ত বিচিত্র ভাবের অলোড়ন চলছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। কেন ওর মনে এই প্রশান্তি? মা বাবা তাই উদ্বিগ্ন।

হারম্যান একদিন বললেন—এ ক'মাস মিউনিকে ও বেশ ধকল সহ্য করেছে।

পলিন ধীরে ধীরে বললেন—অ্যালবার্টল বড় ক্লান্ত। বাড়িতে

থাকলে আর খাওয়া দাওয়া করলে দু'দিনেই ও আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। তাছাড়া এই সুন্দর আবহাওয়া ওকে আনন্দিত করবে।

—সে ত খুব ভাল কথা! কিন্তু এখানেও ত ব্যবসার অবস্থা সুবিধাজনক নয়। বেকার একটা ছেলেকে পোষা আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে না। নিজের ভবিষ্যতের কথা ওর নিজেকেই ভাবতে হবে। বল ত, এই বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে ও করবে কি? কি হবে ওর ভবিষ্যৎ জীবন? ও ত কোন কাজেরই নয়। আমার দোকানে যে বসবে সেটুকু ক্ষমতাও ওর নেই। তেমন ইচ্ছেও ওর মনে আছে বলে মনে হয় না। কেবল বই পড়বে আর স্বপ্ন দেখবে।

পলিন আস্তে আস্তে বললেন—কিন্তু অঙ্কে ওর মাথা খুব ভাল। অঙ্ক ওর কাজে লাগতে পারে।

—সংখ্যার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে অ্যালবার্ট খুব পাকা। জ্যামিতিক প্রব্লেমগুলোও সহজে কষতে পারে। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেলে পাটীগণিতে আরও পাকা হওয়া প্রয়োজন। ওর সাথে কথা বলে দেখি ও কি পড়তে চায়। হারম্যান বললেন।

—ঠিক বলেছ। নিজের ভবিষ্যতের কথা ওর চিন্তা করা দরকার। ছুটি ত এখনও শেষ হয়নি। বাড়িতে বিশ্রাম নিক। খাওয়া দাওয়া করে দেহটা সুস্থ করে তুলুক। ও ত একদম ভেঙে পড়েছে। তারপর পড়াশুনোর কথা বল।

স্কুলের স্মৃতি ওকে বিষণ্ণ করে রেখেছে সদা-সর্বদা। সেই জঘন্য স্মৃতি মুছে যাক ওর মন থেকে। আবার পড়াশুনো করার মতন উৎসাহ আসুক ওর মনে। ভাল কথা। হারম্যান ছেলের মনের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষায় রইলেন।

অ্যালবার্টের ভাবুক মনে কিন্তু নতুন চিন্তা উঁকি দিচ্ছিল।

না, ও আর জার্মানীতে ফিরে যাবে না। সেই ক্ষ্যাপা মাস্টারমশায়ের সামনে বসে নীরস ল্যাটিন ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে সে

কিছুতেই পারবে না। হয় ত জার্মানীতে ফিরে না যাওয়ার জন্যে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে! ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে! কিন্তু এখানকার এই সুন্দর ছুটির দিনগুলোকে সে উপভোগ করতে চায়।

এবার অফুরন্ত বই পড়ার সুযোগ পেয়েছে অ্যালবার্ট।

এমনি ধরনের সুযোগ আর স্বাধীনতা সে মনে মনে চাইছিল। এগুলো স্কুলের নীরস বই নয়—তার উপর পরীক্ষার জন্যে মুখস্থও করতে হচ্ছে না। পড়ছে জানবার জন্যে, আনন্দের জন্যে। তাই কখনও ইতিহাস কখনও বা অজানাকে জয় করার অভিযানের কাহিনী আবার কখনও বা মনীষীদের জীবন চরিত। তার মতন কিশোরদের পক্ষে উপযুক্ত বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা স্বল্প। তবু হাতের কাছে বিজ্ঞানের বই পেলেই অ্যালবার্ট সে বই একমনে পড়তে থাকে। নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। যখন যেখানে যায় অ্যালবার্ট সেখানেই তার হাতে থাকে একখানা না একখানা বই। এমন একমনে সব ভুলে যে ছেলে বই পড়ে তার কেন লেখাপড়া হবে না? সে কেন বুদ্ধিহীন হতে যাবে? অবাক হয়ে ভাবেন পলিন। তাঁর কেবলই মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে। অ্যালবার্ট সম্পর্কে সবাই ভুল করছে। ভুল করছেন সবচেয়ে বেশি স্কুলের মাস্টারমশায়রা। তাঁরা প্রথম থেকে অ্যালবার্টকে বুঝতে পারেন নি। তাকে বুঝতে চেষ্টাও করেন নি।

হারম্যান এবং পলিন—তাঁরাও ছেলের চরিত্র, মেজাজ এবং মানসিক ভাঙা-গড়া বিচার করতে সক্ষম হন নি।

মাবার বন্ধুরা অ্যালবার্টকে খুব পছন্দ করত তার শান্ত মিষ্টি স্বভাবের জন্য। তারা অ্যালবার্টকে তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাত। বলতো, চল না অ্যালবার্টো আমাদের সাথে বেড়িয়ে আসবে।

অ্যালবার্ট ওদের সঙ্গে বেড়াতে যেত।

খুব চালাক নয় অ্যালবার্ট, আর খুব গুছিয়ে কথা বলার মতন সপ্রতিভ নয়। খুব লাজুক প্রকৃতির কিশোর। তবু সে তাদের কাছে

ছোট ছোট গল্প বলত। নানা ধরনের ধাঁধাঁর উত্তর শুনিয়ে সবাইকে খুশি করত। কথা বলার ধরনে কিশোরীরা হেসে গড়িয়ে পড়ত।

মাঝে মাঝে অ্যালবার্ট কোনও নির্জন স্থানে বসে বই পড়ে সময় কাটাত। ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসত অ্যালবার্ট।

রোদ ঝলমল, খোলামেলা প্রকৃতির বুকে বেড়ানোর অর্থ প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ লাভ করা। গাছ ভরা সবুজ পাতার ঝিলিক, ছোট একটা পাতার কোলে আধফোটা একটা ফুলের কুঁড়ি, জলপ্রপাতের ভীষণ কল্লোল, কিম্ভূতকিমাকার একখানা বিশাল পাথর কিংবা অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বল বর্ণালী। এসব দেখে আর তার মনে অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। বাতাসের ছোঁয়ায় হ্রদের বুকে ঢেউয়ের মাতামাতি শুরু হয়···তখন অবাক চোখে ঢেউয়ের খেলা দেখে অ্যালবার্ট। তারা-ভরা আকাশে নরম ঠাণ্ডা চাঁদের আলো যেন হাসছে, এসব দেখে আর নতুন কোনও জীবনের অস্তিত্ব সে অনুভব করে।

মানুষের কীর্তিগুলোও ত কম বিস্ময়কর নয়! মিলানের সুমহান গীর্জা··কত মুহূর্ত অ্যালবার্ট ওই গির্জার উপাসনা ঘরে কাটিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা বিশাল ঘর···একসাথে দশহাজার মানুষ একই সময়ে উপাসনা করতে পারে। জাফরির জানালা, লম্বা বারান্দা। আর এই সেই সান্টা মারিয়া গীর্জা। আর ওই সেই দেওয়ালে আঁকা বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'দি লাস্ট সাপার!' শিল্পী লিওনার্দো দ্য-ভিঞ্চি।

অ্যালবার্ট অবাক হয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে ছবিখানা দেখে।

বাড়ি ফিরে মাকে বলে অ্যালবার্ট—বড় সুন্দর ছবি ওই 'দি লাস্ট সাপার অটুট রয়েছে।' তবে বলতে বলতে অ্যালবার্ট থেমে পড়ে।

অবাক হন পলিন। ওই জগৎবিখ্যাত ছবি সম্পর্কে আবার কিছু বলে বসবে না ত অ্যালবার্ট!

—জান মা-মণি, দ্য ভিঞ্চির আঁকা রঙ অনেক বিবর্ণ হয়ে গেছে!

যাক্! নিশ্চিন্ত হন পলিন। বলেন—এতে অবাক হওয়ার কি আছে! ছবিখানা শিল্পী প্রায় চার শ' বছর আগে এঁকেছিলেন! এত

বছরে ছবির কিছুটা রঙ ত বিবর্ণ হবেই।

অ্যালবার্ট মাথা নাড়ল—এর চেয়ে আরও পুরানো ছবির রঙ এর চেয়েও উজ্জ্বল আছে। ছবির রেখাও আছে স্পষ্ট! ভ্য-ভিঞ্চি এ ছবিতে নতুন রঙ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আসলে উনি মনে প্রাণে ছিলেন একজন বিজ্ঞানী। হাঁ শিল্পী বিজ্ঞানী। তাই জ্ঞানের সীমা পেরিয়ে চলতে চেয়েছেন।

ছেলের কথা শুনে মা-কে এবার চিন্তিত হতে হয়।

এ কি সৃষ্টিছাড়া কথা বলছে অ্যালবার্ট! ভ্য-ভিঞ্চি না-কি শিল্পী নয়, আসলে বিজ্ঞানী!

মনে মনে বিরক্ত হন পলিন। বলেন—বাজে ব'কো না। যা' জানা গেছে তাতেই সব মানুষের খুশি থাকা উচিত। জানা জিনিস ছেড়ে অজানা জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বোকামি।

—কেন বোকামি বলছ, মা-মণি? পরীক্ষা না করে কি নতুন জিনিষ জানা যায়। বিজ্ঞানীরা ত অজানাকেই জানতে চান!

—তোমার কথা যদি ঠিক হয় অ্যালবার্ট্‌ল তবে বলতে হবে যে, শিল্পী সেদিন বোকামি করেছিলেন। আর তাঁর বোকামির জন্যে আমরা আজ ছবিখানার রঙ বিবর্ণ দেখছি। পলিন জবাব দেন।

মায়ের কথা কিন্তু অ্যালবার্টের কানেই যাচ্ছিল না। তার মন তখন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল অ্যালবার্ট!

ভাবুক ছেলের চরিত্র জানেন পলিন। তাই ধীরে ধীরে উনি ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

অ্যালবার্ট সহসা ডাকল—মা-মণি!

পলিনের যাওয়া হল না। থমকে দাঁড়ালেন।

—দেশটার চারধার একবার ঘুরে দেখে আসার ইচ্ছে! অনেক কিছু দেখবার আছে।

পলিন এবার শঙ্কিত হলেন ছেলের কথা শুনে। দেশ ভ্রমণ করতে চায় অ্যালবার্ট! তার মানে অজস্র খরচের ব্যাপার। বিনা খরচে

ত ভ্রমণ সম্ভব নয়। কিন্তু ভ্রমণের জন্য অর্থ ওরা কোথায় পাবে?

তাই ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা গলায় বললেন পলিন—সত্যি! তোমার দেশভ্রমণের খুব ইচ্ছা, তাই না? কিন্তু বাবা, তার জন্যে খরচ করবার মতন পয়সা ত নেই! জান ত বাবার ব্যবসার অবস্থা খুব ভাল নয়!

অ্যালবার্ট আরও শান্ত। বলল—তা জানি মা। কিন্তু আমি ত টাকা পয়সা চাইছি না। পায়ে হেঁটে ঘুরব মা-মণি। খোলা মাঠে ঘুমোব। পথের ধারে আশ্রয় নেব!

পলিন আর ছেলেকে বাধা দিতে পারেন না। তবে মায়ের মন ত··· তাই ছেলের জন্যে দুর্ভাবনা মায়ের মন থেকে ঘোচে না।

ক'দিন পরেই দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ল অ্যালবার্ট।

ওর ইচ্ছা, পায়ে হেঁটে সারা ইটালি ঘুরবে। তাই চলল সোজা দক্ষিণ দিকে লোম্বার্ডি উপত্যকা। সবুজ সবুজ আর অফুরন্ত সবুজের সমারোহ। গাছ-গাছালি আর খেতের নানা ধরনের ফসলে সারা উপত্যকা সবুজ। লোম্বার্ডি পার হয়ে অ্যালবার্ট হাজির হল জেনোয়া। সাজানো বন্দর শহর। ভ্রমণে চলাই ত আনন্দ। সমুদ্র তীর ধরে আরও দক্ষিণে চলল সে। পথে পড়ল পিসা শহর।

গ্যালিলিও-র নাম জড়ানো সেই পিসা শহর। সেই লিনিঙ টাওয়ার··হেলান গম্বুজ। পথ যেন ফুরোয় না। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। কখনও সবুজ মাঠ কখনও বরফের শিরোপা পরা পর্বত, আবার কখনও নীল সাগরের ঢেউ। শহর, বন্দর, গ্রাম। চারধারে চোখ জুড়ানো শোভা।

পাহাড়ের কোলে ছবির মতন ছোট বড় কত না গ্রাম। চলতে চলতে অ্যালবার্ট ওখানে সাময়িক আস্তানা নিল। মনের খুশিতে গ্রাম দেখল, তারপর আবার অজানার ডাকে পথে নামল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন হাজির হল ফ্লোরেন্স নগরীতে।

সুন্দরী ফ্লোরেন্স। কলা-সম্পদে ভরপুর। পাহাড়ের উপর থেকে শহরটা দেখতে ছবির মত। অ্যালবার্ট এখানে কদিন বিশ্রাম করল।

সারা জীবন ধরে কত ঘুরেছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কত নতুন নতুন দেশ দেখেছেন, জেনেছেন কত না অজানাকে। কিন্তু সেদিন সেই কিশোর বয়সে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ লাভ করেছিলেন তেমন সারা জীবনে আর কখনও লাভ করেন নি। বহুকাল ধরে এই ভ্রমণের স্মৃতি তাঁর মনকে আনন্দিত করে রেখেছিল।

অ্যালবার্ট মিলানে ফিরে এল।

ঘরে নতুন দুঃখের সংবাদ অ্যালবার্টের জন্য অপেক্ষা করছিল।

হারম্যানের ব্যবসা আবার মার খেয়েছে। দোকান উঠে গেছে। আবার নতুন জায়গায় ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য তৈরি হচ্ছেন হারম্যান। এবার পরিবার পরিজন নিয়ে উনি যাবেন প্যাভিয়া শহরে।

চার

ছিন্নমূল আইনস্টাইন পরিবার।

মিউনিখ থেকে মিলান। তারপর মিলান থেকে প্যাভিয়া। নতুন শহর, নতুন তার পরিবেশ। এখানেই আবার দোকান খুলতে হবে। আত্মীয়েরা অবশ্য সাহায্য করছেন হারম্যানকে। কিন্তু শহরের অন্য লোকজনদের সাথে ত হারম্যান পরিচিত নন। একেবারে নতুন লোক এই শহরে। পলিনকে এখানেই আবার সংসার সাজাতে হবে।

এমন অবস্থায় সংসারে ষোল বছরের একটা ছেলের কোনও মূল্য নেই। সংসার এবং ব্যবসা গড়ে তোলার কাজে সে এতটুকু সাহায্য করতে পারে না। বরং সে যেন সংসারের ঘাড়ে একটা বাড়তি বোঝা।

অ্যালবার্টের লেখাপড়ার খরচ চালাবার ক্ষমতা আর হারম্যানের নেই। অথচ ভবিষ্যৎ-জীবনকে গড়ে তোলার জন্যে অ্যালবার্টকে একটা কিছু করতেই হবে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর বোঝা হারম্যান চাপাতে চান না। অ্যালবার্টের এখন বয়স হয়েছে। সংসারের হাল সে বুঝতে শিখেছে। কি করবে সে নিজেই ঠিক করুক, বেছে নিক।

কি করবে অ্যালবার্ট?

আবার কি মিউনিখে প্রারম্ভিক বিত্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হবে? সেখানকার পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে বিশ্ববিত্যালয়ে ঢুকবে? নিজেকে তৈরি করবে অধ্যাপক হওয়ার জন্য?

কিন্তু ছেলের বুদ্ধি আর মেধা সম্পর্কে কোনও উচ্চ ধারণা করতে পারেন না হারম্যান। ও ছেলের লেখাপড়া হবে না। আর যার লেখাপড়া হবে না তার হাতের কাজ শেখাই ভাল। কারিগর হতে পারবে। হাতের কাজ ভালভাবে শিখতে পারলে তার পক্ষে অর্থ উপার্জন করা শক্ত হবে না। অভাব হবে না জীবিকার। তবে একটা যে-কোন কাজ তাকে শিখতে হবে। সেই কাজে মন দিতে হবে।

হারম্যান একদিন ছেলেকে বললেন—দেখ, বেকার বসে থেক না! লেখাপড়া যখন হল না তখন হাতের কাজ শেখ।

চুপ করে বাবার কথা শুনছিল অ্যালবার্ট।

—কোন ধরনের কাজ শিখতে চাও, ছুতোরের কাজ না লোহার মিস্ত্রির কাজ? কাজের ছোট বড় কিছু নেই। জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ যে কোনও কাজ শিখতে পারে। সব শ্রমের সমান মর্যাদা। সমাজে শ্রমিকের স্থান একই।

অ্যালবার্ট নীরব।

—তবে যদি ইলেকট্রিকের কাজ শেখ তাহলে আমার দোকানের সুবিধা হবে।

অ্যালবার্ট নিজেও এসব কথা ভাবছে। ভাবছে সব সময়। এই ভাবনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জীবনে কোন পথ সে গ্রহণ করবে? স্কুলের জীবনে সে আর ফিরে যেতে পারবে না। পীড়ন আর তাড়না সহ্য করে কখনও কিছু শেখা যায় না। তাই চিরকালের জন্যই সে স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। আর জীবনে এই যে হন্যে হয়ে ছোটার ইচ্ছা···অর্থ চাই, খ্যাতি চাই, চাই সব রকম ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা...না, এ সবের প্রতিও তার লোভ নেই। না, এ সব সে চায় না। সে চায় সুস্থ আর সবল হয়ে বেঁচে থাকতে। চায়

অফুরন্ত জ্ঞানলাভের জন্য অজস্র বই পড়তে।

তাই অ্যালবার্টের ধারণা, একটা মাত্র কাজই সে করতে পারে। অধ্যাপনার কাজই তার মনের মতন কাজ। তার পছন্দ মতন পথে সে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারবে। সুকুমার মতি ছেলেদের মাথায় পীড়নের হাতুড়ি মেরে কখনও লেখাপড়া শেখানো যায় না। সত্যিকারের একজন অধ্যাপক হতে গেলে চাই অফুরন্ত সহ্যশক্তি, হতে হবে চিন্তাশীল এবং ছাত্রদের প্রতি দরদী। সহজ ভাষায়, সরল পথে পড়ানোর বিষয়বস্তু ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু অ্যালবার্ট অধ্যাপক হবে কিসের জোরে? সে ত প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে নি। প্রবেশ করে নি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেবল পড়াশুনা করেছে অজস্র বই নিয়ে। বিজ্ঞানের নানা বিষয় সে মন দিয়ে পড়েছে।

এর জন্যে কে তাকে প্রশংসা-পত্র দেবে?

মা আর ছেলের মধ্যে স্নেহের বন্ধন। ছেলের মনের খবর ত মায়ের কাছে অজানা নয়। পলিন ছেলেকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর স্নেহ ভালবাসা অন্ধ নয়। এটা তিনি বুঝেছিলেন যে, ধরা-বাঁধা কোনও কাজ অ্যালবার্ট করবে না। তার পক্ষে তেমন কাজ করা সম্ভব নয়। অ্যালবার্ট স্বপ্নবিলাসী, বাস্তব জীবনের প্রতি উদাসীন। নিয়ম-কানুন মেনে চলতে পারে না। এর উপর বড় হওয়ার, অর্থ-খ্যাতি অর্জন করার কোনও উচ্চাশাও তার মনে নেই।

হারম্যান নিজেও ছেলের মনের খবর জানেন।

শেষে অনেক ভাবনা, অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হল যে অ্যালবার্ট কারিগরী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। অঙ্কে ওর মাথা আছে। হারম্যানের ইলেকট্রিক সরঞ্জামের দোকান রয়েছে। কাজেই কারিগরী শিক্ষাই ওর পক্ষে উপযুক্ত হবে।

কিন্তু প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র ত অ্যালবার্ট পায় নি? কারিগরী বিদ্যালয়ে কি করে সে পড়বে? অ্যালবার্ট অবশ্য ভাল

অঙ্ক কষতে পারে। কলেজে ঢোকার পরীক্ষা দিলে ও নিশ্চয় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

হারম্যান জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেকে—কারিগরী বিদ্যালয়ে পড়বে ত?

অ্যালবার্ট জবাব দিল—হাঁ। কিন্তু জার্মানীতে যাব না। অন্য কোনও দেশে যাব।

জার্মানীর স্কুল সম্পর্কে অ্যালবার্টের মনে ভীষণ ভয়।

হারম্যান আর পলিন ঠিক করলেন যে, জুরিখের সুইস্ ফেডারেল পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেকে ভর্তি করার জন্য প্রথমে চেষ্টা করবেন। কারিগরী শিক্ষায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম আছে।

সুইজারল্যাণ্ডে আইনস্টাইন পরিবারের অনেক ধনী আর সম্পন্ন আত্মীয় বাস করতেন। তাঁদের যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। হারম্যান প্যাভিয়া থেকে এ সব আত্মীয়দের কাছে চিঠি লিখলেন।

অ্যালবার্টের এক মামা চিঠির জবাবে জানালেন যে, তিনি মাসে মাসে এক শ' সুইস্ ফ্রাঙ্ক পাঠাবেন। ও যেন কলেজে ভর্তি হয়।

প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য খুবই সামান্য···তবে অ্যালবার্ট যদি বুঝেসুঝে খরচ করে তাহলে কোনও রকমে চলে যাবে।

একটা সামান্য আশার আলোক দেখলেন হারম্যান আর পলিন।

জুরিখে গিয়ে এবার পরীক্ষা দেওয়ার পালা।

এক রোদ ঝলমল দিনে অ্যালবার্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সুইজারল্যাণ্ডে যাবেন।

ইউরোপের হৃদপিণ্ড যেন এই দেশটা। বরফ-জমা আলপস পাহাড়ের শিখর। কোথাও সবুজ ফসলের ক্ষেত, কোথাও বা একটানা বরফ জমা মালভূমি। আবার কোথাও বা মনোরম হ্রদ। কোথাও কোথাও পাহাড়ের কোলে পাইন, ফার আর পপলারের জঙ্গল।

চারধারে এই বাধাহীন প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে মন আপনা থেকেই খুশি হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে নানা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সে সব দুর্ভাবনা মনে এল অ্যালবার্টের। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের সৌন্দর্য উপভোগ করছে তখন সে একদৃষ্টিতে। ওর মনে একমাত্র আশা, অঙ্কে ও ভাল। কাজেই অঙ্কের সাহায্যে ও নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবে।

জুরিখে সে পৌঁছাল। একা। অচেনা শহর। লাজুক কিশোর। এই পরীক্ষার ব্যাপারে কারো কাছে যে সাহায্যের আবেদন করবে তেমন ক্ষমতাও ওর নেই।

পরীক্ষার নাম শুনলেই অ্যালবার্টের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কেননা পরীক্ষার সাগর পার হতে হলে গাদা গাদা বই পড়তে হয়, মুখস্থ করতে হয়। তারপর সেই মুখস্থ-করা বিদ্যার গাদা হাতড়ে প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে হবে। আর এমনিভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, বিদ্যার সাগরের কিছু জল আমার পেটে ঢুকেছে।

প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা আর ভাষা-তত্ত্ব…এই তিনটে বিষয়ই অ্যালবার্টের কাছে বড় ভয়ের ব্যাপার। বোঝার চেয়ে মুখস্থ করতে হয় বেশি। তবু অ্যালবার্ট এই বিষয়গুলোর পরীক্ষা দিল। অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা সম্পর্কে তার কোনও ভাবনা নেই। সে সব প্রশ্নের জবাব লিখেছে।

পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল। কিন্তু ফলাফল জানবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হল অ্যালবার্টকে। জুরিখ ছেড়ে যেতে পারল না।

পরীক্ষার ফল বেরোল। বিদ্যালয়ের পরিচালক অ্যালবার্টকে ডেকে পাঠালেন। অ্যালবার্ট পরিচালকের সামনে হাজির হল। সে তখনও ফলাফল জানে না।

—তুমি কি ইটালি থেকে এসেছ?

অ্যালবার্ট জবাব দিল—হাঁ, মিলান থেকে এসেছি।

—কোথায় পড়াশুনো করেছ?

—মিউনিখ শহরে। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল অ্যালবার্ট।

এবার পরিচালক বললেন—দেখ আইনস্টাইন, তুমি যা' পরীক্ষা দিয়েছ তা'তে তোমাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যায় না।

এত পরিশ্রম, এত আশা বিফল হল!

তবু ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল অ্যালবার্টের। ক্লান্ত দৃষ্টি। অ্যালবার্ট নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মন দুর্ভাবনায় ভারি। বার বার ওর জীবনে একই ঘটনা ঘটছে। কেন ঘটছে? ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলো যত নষ্টের গোড়া! বেবুনের দেহকাণ্ড, বীজ থেকে গাছের রূপান্তর, আর লিনেটের দেহ বর্ণনা···এসব ও কিছুতেই মুখস্থ করতে পারে না। সব মিলিয়ে মিশিয়ে গণ্ডগোল হয়ে যায়। এর উপর আবার রয়েছে ইতিহাস। যুগে যুগে মানব-সমাজের ইতিহাসে কত না বিপ্লব ঘটে গেছে। সে সব অতীত কাহিনী। পরীক্ষার জন্য সে-সব কাহিনীর সন তারিখ মুখস্থ করতে হবে।

এগুলো অ্যালবার্টের ছাত্র-জীবনে যেন ধারালো কাঁটার মতন উঁচিয়ে আছে।

অ্যালবার্টের নীরবতা দেখে পরিচালক মশায় রেগে গেলেন। ভাবলেন, ছোকরা ত খুব অবাধ্য আর অভব্য। তার নিজের অক্ষমতার জন্য কই সে ত একবারও দুঃখ বোধ করল না। যেন নিজের অক্ষমতার জন্য সে মনে মনে খুব গর্বিত।

তাই তিনি রেগেমেগে ধমক দিলেন—এই বিদ্যের দৌড় নিয়ে তুমি এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছ! যাও!

শান্ত স্বভাব অ্যালবার্ট। এবার ধীরে ধীরে বলল—ধন্যবাদ। আমি যাচ্ছি। আপনারা যে ধৈর্য ধরে আমাকে পরীক্ষা করেছেন তার জন্য আমি খুশি। ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্য অ্যালবার্ট ঘুরে দাঁড়াল। অবশেষে আর একটা ব্যর্থতা তার মন বিষণ্ন করে তুলল।

এবার অ্যালবার্টের শান্ত-ধীর স্বভাব এবং কথাগুলো পরিচালককে মুগ্ধ করল।

তাড়াতাড়ি বললেন—শোন আইনস্টাইন, অঙ্ক আর পদার্থ-বিদ্যায় তুমি খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছ। এর জন্যে আমরা তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে নিতে পারি। কিন্তু তা' আমরা করব না! তুমি বরং আর কিছু দিন প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে অন্য বিষয়গুলো ভালভাবে শিখে এস। আমরা তখন তোমায় স্কুলে ভর্তি করে নেব।

খুশি মনে অ্যালবার্ট ঘাড় নাড়ল।

অ্যালবার্টকে চলে যেতে দেখে পরিচালক মশায় আবার বললেন—আরাউ শহরে ভাল স্কুল আছে। তুমি সেখানে গিয়ে পড়াশুনো কর।

আবার প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হবে, আবার সেই ব্যাকরণের সূত্র আর ইতিহাসের সন-তারিখ মুখস্থ করতে হবে? আবার সেই রাগান্বিত অধ্যাপকদের সামনে বসে পড়তে হবে? কিন্তু না। অ্যালবার্ট মনে মনে ভাবল, তার দ্বারা আর প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়।

মুক্ত পৃথিবীর বুকে খুশি মতন বেড়াবার স্বাধীনতা অ্যালবার্ট পেয়েছে। সে আর স্কুলের গারদ-ঘরে বন্দী হবে না। পড়াশুনা না হয় না হবে।

কিন্তু খালি পেটে ত কেবল হাওয়া খেয়ে বেড়ালে চলে না! তার বয়স হয়েছে। এখন বেকার থাকলে বাড়িতে সে জায়গা পাবে না। হয় পড় প্রারম্ভিক স্কুলে আর না হয় টাকা রোজগার করার জন্য একটা না একটা কাজ কর। সে স্যুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক নয়, কাজেই এখানে কেউ তাকে কোন কাজ দেবে না। প্যাভিয়া শহরে গিয়েও সে কাজ পাবে না।

তাহলে কি করবে এখন অ্যালবার্ট?

মনে মনে অনেক ভাবল অ্যালবার্ট। শেষে ইচ্ছা না থাকলেও একদিন আরাউ শহরের দিকে পা বাড়াল। জুরিখ থেকে মাইল পঁয়ত্রিশ দূরে আরাউ শহর। এখানে পরিচিত তার কেউ নেই। সাহস করে সে প্রারম্ভিক স্কুলে হাজির হল।

এবং স্কুলের শেষ ক্লাসে ভর্তি হল।

স্কুল সম্পর্কে একটা দারুণ ভয় ছিল অ্যালবার্টের মনে।

কিন্তু আরাউতে অ্যালবার্টের স্কুল সম্পর্কে সব ধারণা একদম বদলে গেল। অবাক হল, কই স্কুলে পড়াশুনা করা ত আর ভীতিজনক নয়। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়ান এবং প্রতিটি পাঠ সহজভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন। ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন।

বিজ্ঞানের সব বিষয় পড়ানোর জন্যে স্কুলে ল্যাবরেটরি রয়েছে। সেখানে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানের সত্য প্রমাণ করা যায়। অ্যালবার্ট দেখল যে, এত দিন যে সব বিষয় তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হত এখন সেগুলো তার কাছে জলের মতন সহজ।

স্কুলের অধ্যক্ষ উইন্টলার সাহেব।

শান্ত-স্বভাব ও কর্মঠ অ্যালবার্টকে তাঁর খুব ভাল লাগল।

একদিন তিনি অ্যালবার্টকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন।

—আমার বাসায় একদিন এস, অ্যালবার্ট। তোমার ভাল লাগবে। আমার ছেলেমেয়েদের সাথে তোমার পরিচয় হবে।

প্রথমটায় অধ্যাপকের বাড়ি যাওয়ার নিমন্ত্রণ লাজুক অ্যালবার্ট এড়িয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু অধ্যাপক উইন্টলার আবার একদিন তাকে বললেন—কই গেলে না অ্যালবার্ট ?

শেষে এক সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট অধ্যাপকের বাড়িতে হাজির হল।

উইন্টলার পরিবারের সবাই খুব খুশি হলেন অ্যালবার্টকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে। গল্পে গানে সারা সন্ধ্যাটা ওরা আনন্দে কাটাল। ওদের সাথে প্রথম দিনেই অ্যালবার্টের সহজ হৃদ্যতা গড়ে উঠল। ওরা যেন অ্যালবার্টের কত কাছের মানুষ, কত আপন জন।

এই অপরিচিত শহরে অ্যালবার্ট একটি পরিবারের ভালবাসা জয় করল। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে কিংবা ছুটির দিনে অ্যালবার্ট

অধ্যাপকের বাড়িতে যেত। একদিন উইণ্টলার বললেন—তোমার পড়াশুনোর অসুবিধা হচ্ছে, তুমি আমার এখানে চলে এস।

অবাক হল অ্যালবার্ট! বলল—আপনার এখানে চলে আসব। কিন্তু আপনাদের ত অসুবিধে হবে।

—না, না। তুমি চলে এস। এত বড় বাড়ি ফাঁকা ত রয়েছে।

এমন সহজ হৃদ্যতা এই শহরে পাবে তা আশা করেনি অ্যালবার্ট।

বোর্ডিং হাউসের ছোট্ট কুঠরি ছেড়ে অ্যালবার্ট একদিন উইণ্টলার-দের বাড়িতে চলে এল।

উইণ্টলারদের বাড়ির সকলে অ্যালবার্টকে তার খুশি মতন একলা থাকতে দিল। গম্ভীর আর শান্ত স্বভাব অ্যালবার্ট নির্জনে নিজের পড়াশুনায় ডুবে থাকত। এতদিন ধরে সে এটাই চাইছিল। কেবল মন দিয়ে পড়বে। আরো আরো বেশি বই পড়বে।

মাঝে মাঝে অ্যালবার্ট ছোটদের সাথে খেলায় মেতে উঠত।

তাদের সঙ্গে বাগানে লুকোচুরি খেলত, চড়ুইভাতিতে যোগ দিত।

তবে অ্যালবার্ট সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত ভ্রমণ। আরাউ-এর খোলা-মেলা পরিবেশে আপন মনে সে ঘুরে বেড়াত। কোথাও অসীম বিস্তৃত উপত্যকা, সবুজের মেলা। কোথাও বা নীলাভ টলটলে জলের হ্রদ। তীরে অজস্র ডাফোডিল ফুটে আছে। আবার কোথাও বা পাহাড়ের কোলে পপলার আর বুনো ঝাউয়ের জঙ্গল। শীতের মরশুমে চারিদিকে বরফ জমে সাদা হয়ে যেত।

বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন পরিবেশ।

আর এমনিভাবে বেড়াবার সময় অ্যালবার্ট বিজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবত।

এই ভ্রমণই ছিল তরুণ অ্যালবার্টের একমাত্র দৈহিক ব্যায়াম। ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে সে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটত, একা একা এমনিভাবে ভ্রমণ করার মধ্যে সে যেন নিজেকে খুঁজে পেত।

আরাউতে আসার সময় মায়ের দেওয়া বেহালাখানা অ্যালবার্ট

এবং স্কুলের শেষ ক্লাসে ভর্তি হল।

স্কুল সম্পর্কে একটা দারুণ ভয় ছিল অ্যালবার্টের মনে।

কিন্তু আরাউতে অ্যালবার্টের স্কুল সম্পর্কে সব ধারণা একদম বদলে গেল। অবাক হল, কই স্কুলে পড়াশুনা করা ত আর ভীতিজনক নয়। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়ান এবং প্রতিটি পাঠ সহজভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন। ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন।

বিজ্ঞানের সব বিষয় পড়ানোর জন্যে স্কুলে ল্যাবরেটরি রয়েছে। সেখানে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানের সত্য প্রমাণ করা যায়। অ্যালবার্ট দেখল যে, এত দিন যে সব বিষয় তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হত এখন সেগুলো তার কাছে জলের মতন সহজ।

স্কুলের অধ্যক্ষ উইন্টলার সাহেব।

শান্ত-স্বভাব ও কর্মঠ অ্যালবার্টকে তাঁর খুব ভাল লাগল।

একদিন তিনি অ্যালবার্টকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন।

—আমার বাসায় একদিন এস, অ্যালবার্ট। তোমার ভাল লাগবে। আমার ছেলেমেয়েদের সাথে তোমার পরিচয় হবে।

প্রথমটায় অধ্যাপকের বাড়ি যাওয়ার নিমন্ত্রণ লাজুক অ্যালবার্ট এড়িয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু অধ্যাপক উইন্টলার আবার একদিন তাকে বললেন—কই গেলে না অ্যালবার্ট?

শেষে এক সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট অধ্যাপকের বাড়িতে হাজির হল।

উইন্টলার পরিবারের সবাই খুব খুশি হলেন অ্যালবার্টকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে। গল্পে গানে সারা সন্ধ্যাটা ওরা আনন্দে কাটাল। ওদের সাথে প্রথম দিনেই অ্যালবার্টের সহজ হৃদ্যতা গড়ে উঠল। ওরা যেন অ্যালবার্টের কত কাছের মানুষ, কত আপন জন।

এই অপরিচিত শহরে অ্যালবার্ট একটি পরিবারের ভালবাসা জয় করল। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে কিংবা ছুটির দিনে অ্যালবার্ট

অধ্যাপকের বাড়িতে যেত। একদিন উইণ্টলার বললেন—তোমার পড়াশুনোর অসুবিধা হচ্ছে, তুমি আমার এখানে চলে এস।

অবাক হল অ্যালবার্ট! বলল—আপনার এখানে চলে আসব। কিন্তু আপনাদের ত অসুবিধে হবে।

—না, না। তুমি চলে এস। এত বড় বাড়ি ফাঁকা ত রয়েছে।

এমন সহজ হৃদ্যতা এই শহরে পাবে তা আশা করেনি অ্যালবার্ট।

বোর্ডিং হাউসের ছোট্ট কুঠরি ছেড়ে অ্যালবার্ট একদিন উইণ্টলারদের বাড়িতে চলে এল।

উইণ্টলারদের বাড়ির সকলে অ্যালবার্টকে তার খুশি মতন একলা থাকতে দিল। গম্ভীর আর শান্ত স্বভাব অ্যালবার্ট নির্জনে নিজের পড়াশুনায় ডুবে থাকত। এতদিন ধরে সে এটাই চাইছিল। কেবল মন দিয়ে পড়বে। আরো আরো বেশি বই পড়বে।

মাঝে মাঝে অ্যালবার্ট ছোটদের সাথে খেলায় মেতে উঠত।

তাদের সঙ্গে বাগানে লুকোচুরি খেলত, চড়ুইভাতিতে যোগ দিত।

তবে অ্যালবার্ট সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত ভ্রমণ। আরাউ-এর খোলা-মেলা পরিবেশে আপন মনে সে ঘুরে বেড়াত। কোথাও অসীম বিস্তৃত উপত্যকা, সবুজের মেলা। কোথাও বা নীলাভ টলটলে জলের হ্রদ। তীরে অজস্র ডাফোডিল ফুটে আছে। আবার কোথাও বা পাহাড়ের কোলে পপলার আর বুনো ঝাউয়ের জঙ্গল। শীতের মরশুমে চারিদিকে বরফ জমে সাদা হয়ে যেত।

বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন পরিবেশ।

আর এমনিভাবে বেড়াবার সময় অ্যালবার্ট বিজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবত।

এই ভ্রমণই ছিল তরুণ অ্যালবার্টের একমাত্র দৈহিক ব্যায়াম। ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে সে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটত, একা একা এমনিভাবে ভ্রমণ করার মধ্যে সে যেন নিজেকে খুঁজে পেত।

আরাউতে আসার সময় মায়ের দেওয়া বেহালাখানা অ্যালবার্ট

সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অ্যালবার্টের দারুণ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। আকর্ষণ থেকে গড়ে উঠেছিল অনুরাগ। উইন্টলারদের বাড়িতে আসার পরও নিয়মিত সঙ্গীত এবং বাজনার অনুশীলন করার সুবিধা হল। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতের আসর বসত। মোজার্টের গম্ভীর সুরের জালে ওদের বাড়ি স্বপ্নময় হয়ে উঠত। নিজের বেহালা-খানা নিয়ে সেই সুর তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিত স্বপ্নালু অ্যালবার্টের তরুণ মন। মাঝে মাঝে উইন্টলারদের বাগানে একটা নির্জন অংশে বসে অ্যালবার্ট বেহালায় ছড় টানত।

কখনও ঝড়ের উদ্দাম সুর, কখনও খুশির ঝলমলে রাগিনী আবার কখনও বা বিষণ্ণ রাগের যন্ত্রণাময় ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত বেহালার তারে। আর অ্যালবার্ট সুরের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

একটা বছর পার হল। প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ। যে সব বিষয় সম্পর্কে অ্যালবার্টের মনে দারুণ ভয় ছিল, বছরের শেষে সে সব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাড়পত্র লাভ করল। এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত।

এবার উইন্টলারদের বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে জুরিখে।

ওখানে পলিটেকনিকে ভর্তি হবে।

তাকে বিদায় দেওয়ার দিন সমস্ত উইন্টলার পরিবারের লোকজনেরা স্টেশনে হাজির হলেন।

এই ক'মাসে এই লাজুক ছেলেটাকে তাঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। এতদিন সে তাঁদের একান্ত আপনজন হয়ে ছিল। আজ সে চলেছে জুরিখে ··তার সামনে অজানা ভবিষ্যতের হাতছানি।

বিদায়, বিদায় অ্যালবার্ট! যত তাড়াতাড়ি পার আবার ফিরে এস। আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকব।

যারা ছিল অচেনা, পর···যাদের সঙ্গে ছিল না কোন রক্তের সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে চলার পথে গড়ে উঠেছে এক গভীর সম্বন্ধ। আজ তারা আর কেউ অচেনা নয়, নয় পর। কেউ দূরে নয়· তাঁরা সবাই তার আত্মার আত্মীয়।

এক সময় ট্রেনের বাঁশি বাজল।

বিদায় আরাউ! এক তরুণ ছাত্রের জীবনে দান করেছ নতুন ধরনের উৎসাহ!

হে অচেনা শহর তোমাকে ধন্যবাদ! ট্রেন ছাড়ল। ধীরে ধীরে ট্রেনের চাকা গড়িয়ে চলল।

জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে অ্যালবার্ট হাত নেড়ে বিদায় নিল। আজ কেবলই মনে পড়ছে প্রথম দিনের কথা। সেদিন অচেনা শহরে ভয়ে ভয়ে এসে হাজির হয়েছিল। কে তাকে আশ্রয় দেবে? কে তার জন্য চেষ্টা করবে? সে বিদেশী ছাত্র···তার উপর দরিদ্র। কেমন করে সে প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করবে? কিন্তু না! আরাউ তাকে নিরাশ করে নি। শহরের উষ্ণ ভালবাসা তার মনোবল ফিরিয়ে দিয়েছে। আজ সে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার ছাড়পত্রই পায় নি পেয়েছে একলা জীবন পথে চলবার উৎসাহ, মনে অফুরন্ত সাহস।

আরাউ তাকে নতুন মানুষে পরিণত করেছে।

এখানে এই প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ে অ্যালবার্টের পড়ার ধরনটাই ছিল ভিন্নরকম।

স্কুলের ল্যাবরেটারিতে বেশি সময় না কাটিয়ে নামকরা লেখকদের পদার্থবিদ্যার বই পড়ত। এ ধরনের বই তার তরুণ মনকে ভীষণ আকর্ষণ করেছিল। নানা ধরনের সূত্র মুখস্থ করতে হয় তাই অঙ্কের দিকে আর সে মন দিল না।

এই বিশ্ব যে এক বিশাল পদার্থের পিণ্ড। নানা রহস্যের আবরণে

ঢাকা। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে যত বই পড়তে লাগল ততই এই রহস্যের গোপনীয়তা জানার জন্য তার সারা মন অধীর হয়ে উঠল।

কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো ত ছাড়া ছাড়া নয়। তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত। একের সাথে অপরের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, অঙ্ক বাদ দিয়ে পদার্থ বা রসায়ন শাস্ত্র ঠিক মতন বোঝা যায় না। মৌল বস্তুর রহস্য জানতে হলে বিজ্ঞানের সব শাখাকে আয়ত্ত করতে হবে।

উত্তর জীবনে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এই মহা সত্য আরও ভালভাবে বুঝেছিলেন।

জুরিখে এসে পলিটেকনিকে হাজির হলেন অ্যালবার্ট। সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার ছাড়পত্র। আর না বলার উপায় নেই। প্রয়োজন নেই পরীক্ষার।

অ্যালবার্ট ভর্তি হল। বছর সতের বয়স তখন। অত্যন্ত সাধারণ চেহারা অ্যালবার্টের। আপন ভোলা এবং লাজুক। পোশাক-আশাক বা সাজ-গোজের দিকে তত মন নেই। প্রয়োজনের জন্য মানুষ পোশাক পরে, বিলাসিতার জন্য নয়। তাই অ্যালবার্টের পোশাক ধোপ-দুরস্ত বা পরিপাটি ছিল না। মাথায় অগোছাল এক মাথা চুল। আর দু'চোখে গভীর দৃষ্টি। সাধারণ···এবং অতি সাধারণ ছাত্র অ্যালবার্ট। তাই বিদ্যালয়ের পরিচালকরা তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন না।

এই ছাত্রটি যে একদিন বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী হবে তা সেদিন পরিচালকরা ভাবতে পারেন নি। ভাবতে পারেন নি কলেজের অধ্যাপকরাও।

সহপাঠীরাও অ্যলবার্ট সম্পর্কে খুব বিরাট ধারণা করার সুযোগ পায় নি। ছাত্র-জীবনে অ্যালবার্টকে দারুণ অভাবের জ্বালা ভোগ করতে হত।

দরিদ্র আইনস্টাইন পরিবারের ক্ষমতা ছিল না বিদেশে ছাত্র অ্যালবার্টকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য পাঠান। কাজেই মামার অর্থ সাহায্যটুকু সম্বল করেই অ্যালবার্ট জুরিখে আশ্রয় নিয়েছিল।

ভর্তি হয়েছিল পলিটেকনিকে। মাসে মাসে মামার সাহায্য মাত্র একশ' ফ্রাঙ্ক। অতি সামান্য সাহায্য। পলিটেকনিকে পড়ার খরচ এবং জুরিখে থাকা খাওয়ার ব্যয় সব কিছু নির্বাহ করতে হবে এই একশ' ফ্রাঙ্কের দ্বারা। কাজেই ছাত্র-জীবনে বিলাসী হওয়ার সুযোগ পায়নি অ্যালবার্ট।

অবসর সময়ে অন্য কোনও কাজ করার উপায় নেই।

জুরিখে অ্যালবার্ট বিদেশী ছাত্র। সুইস নাগরিক সে নয়। তার বাবা-মাও স্যুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক নন। তাই কে অ্যালবার্টকে কাজ দেবে? কলেজে পড়াশুনার জন্য সরকারি সাহায্য থেকেও সে বঞ্চিত। বিচিত্র জীবন অ্যালবার্টের! এক দরিদ্র যাযাবর তরুণ। জন্মেছে জার্মানীর মিউনিখ শহরে…প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠও সেখানে। দরিদ্র পিতা-মাতা ব্যবসার জন্য থাকেন ইতালিতে। জার্মানীর নাগরিকত্ব হারিয়ে তাঁরা এখন ইতালির নাগরিক। আর অ্যালবার্টের নির্দিষ্ট কোনও থাকবার জায়গা নেই। সে জার্মানীর নয়…নয় ইতালির, স্যুইজারল্যাণ্ডের ছাত্র সে ব্যাস! তার বেশি অধিকার তার নেই।

তাই অ্যালবার্ট মনে মনে ঠিক করল স্যুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক তাকে হতে হবে।

এই ক' মাসের মধ্যেই মনোরম স্যুইজারল্যাণ্ডের পরিবেশ তার মন জয় করতে পেরেছে। এ যেন তার আপন দেশ! এখানকার মানুষগুলোও যেন তার কত আপনার। তার সাহায্যকারী মামা এই স্যুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক। অধ্যাপক উইন্টলার আর তাঁর পরিবারের সবাই ত চমৎকার মানুষ। অ্যালবার্ট তাঁদের কথা, তাঁদের ভালবাসা জীবনে ভুলবে না। এমন দেশের নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা কার না হয়?

কিন্তু ইচ্ছা করলেই ত কোন বিদেশী নাগরিক হওয়ার অধিকার লাভ করে না। নাগরিক অধিকার পাওয়ার জন্য খরচ করতে হয়। বেশ কিছু অর্থ চাই।

মাসে মাসে মাত্র একশ' ফ্রাঙ্ক সাহায্য—বাঁচার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবু সেই সামান্য অর্থ থেকে অ্যালবার্ট মাসে মাসে কুড়ি ফ্রাঙ্ক জমাতে শুরু করল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে স্যুইস্ নাগরিক অধিকার পেতে চায়। খরচ বাঁচাতে হবে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একখানা ঘর ভাড়া করল। দু'বেলা খাওয়ার জন্য একটা সস্তা দ্বিতীয় শ্রেণীর রেস্তোরাঁ বেছে নিল। আর যাতায়াতের জন্য কোনও খরচই তার লাগত না। বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সে হেঁটে যাতাযাত করতে লাগল। ভ্রমণ ভালবাসত অ্যালবার্ট—তাই এখন এই অভ্যাসের জন্য তার খরচ বাঁচল। পোশাকের জন্য তার খরচ পড়ত খুবই সামান্য। অতি সাধারণ পোশাক পরতে তার ভালও লাগত। সারা জীবন ধরেই অ্যালবার্ট সাধারণ পোশাকই পরেছে। এর জন্য কোনদিন সে দুঃখ অনুভব করে নি, লজ্জিতও হয় নি।

সে সময় জুরিখ ছিল ইউরোপের অন্যতম শিক্ষার কেন্দ্র।

নানা দেশ থেকে ছাত্ররা জুরিখে পড়তে আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ভর্তি হত। এ যেন শিক্ষার এক মহান কেন্দ্র। স্বাভাবিক ভাবেই অ্যালবার্টের মতন পড়ুয়া ছাত্র খুশি হয়ে উঠল। সে নিজেই যে আরও পড়তে চায়, ভাবতে চায় বিজ্ঞানের গোপন রহস্য সম্বন্ধে। তার মন অজানাকে জানবার জন্যই ত অধীর। এখানে চিন্তা করার স্বাধীনতা পেয়েছে অ্যালবার্ট। তার সত্যান্বেষী মনের দরজা এখানে রুদ্ধ নয়। তাই ত মহাসাগরের বালুবেলায় যেমন সব সময় অসংখ্য ঢেউ ছুটে এসে ভেঙে পড়ে—তেমনি তার মন সমুদ্রের তীরে অনবরত গণনাতীত প্রশ্নের ঢেউরা মাথা কুটছে। এবং এই শিক্ষাকেন্দ্রে অসংখ্য জ্ঞানান্বেষীর মেলায় সে দরদী মনের সন্ধান লাভ করল। তারাও যে তারই মতন জানতে চায়, বুঝতে চায়।

তারা অ্যালবার্টকে আপন করে নিল।

পদার্থবিদ্যার দিকে অ্যালবার্টের মন দারুণ আকৃষ্ট হল। বেশিরভাগ সময় তাই সে পদার্থ বিদ্যার বই পড়ত আর ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষার

কাজ নিয়ে মগ্ন থাকত। ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য সে যেন নিজেকে নিজেই তৈরি করছিল। অধ্যাপকের বক্তৃতার দিকে তার মন থাকত না। আর যে বিষয়ের দিকে তার মন আকৃষ্ট হত না সে বিষয়ে সে একটুও মাথা ঘামাত না।

অ্যালবার্ট একক জীবন যাপন করত।

ফলে জুরিখের সামাজিক অনুষ্ঠানে তাকে দেখা যেত না।

এমন মুখ-চোরা, লাজুক এবং ভালমানুষ ছেলের প্রতি কে আকৃষ্ট হবে? তাই বন্ধুর সংখ্যা তার খুব সীমিত ছিল। দু'চারজন ভাবুক ছেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। চপল স্বভাব আর চঞ্চল খেলোয়াড় ছাত্ররা তাকে একদম পছন্দ করত না।

পড়াশুনা ছাড়া সঙ্গীতের প্রতি ছিল অ্যালবার্টের আকর্ষণ। তার জীবনের প্রিয় অবলম্বন।

মাঝে মাঝে তার মনে সুরের মূর্চ্ছনা জেগে উঠত। তখন বেহালা নিয়ে আপন মনে বাজাত। সুরে জাল বুনত। কিংবা কোনও সঙ্গীতের আসরে বসে নীরবে সুর সাগরে ডুব দিত। সঙ্গীতের প্রতি এই আকর্ষণ তার দিন দিন বাড়ছিল।

একসময় অ্যালবার্ট অঙ্ক শাস্ত্রের প্রতি খুব আকৃষ্ট ছিল। অঙ্কের সমস্যাগুলো সে খুব সহজে বুঝতে পারত। অঙ্কে তার মাথাও খুব পরিষ্কার ছিল! কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অ্যালবার্টের মন ঝুঁকল পদার্থবিদ্যার দিকে। কিছুতেই আর সে অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না।

অধ্যাপক মিঙ্কোওস্কি কলেজে অঙ্ক কষাতেন।

তিনি অ্যালবার্টকে অঙ্ক শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন।

বলতেন—আইনস্টাইন, আগে ত তুমি ভাল অঙ্ক কষতে। আজকাল কি হয়েছে তোমার?

—কই, কিছু হয়নি স্যার!

—তবে তুমি অঙ্ক কষায় মন দিচ্ছ না কেন? তুমি কি বুঝতে

পারছ না ?

—হ্যাঁ। বুঝতে পারছি। কিন্তু অঙ্ক কষতে ইচ্ছে হয় না!

—সে কি! অঙ্ক ত মনে খুব আগ্রহ সৃষ্টি করে।

অ্যালবার্ট লাজুক মুখে ধীরে ধীরে বলল—পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়া-শুনা করতে আমার বেশি ভাল লাগে, স্যার!

উত্তর জীবনে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যখন বিজ্ঞানী বলে সুপরিচিত হলেন তখন বুঝলেন কলেজ জীবনে অঙ্কের প্রতি অবহেলা করে ভুল করেছেন। বিজ্ঞানের সব বিভাগকে আয়ত্ত করার জন্য অঙ্ক শাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাই মাঝে মাঝে অধ্যাপক মিঙ্কো-ওস্কির কাছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দুরূহ গাণিতিক সমস্যা সামাধানের জন্য সাহায্য গ্রহণ করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্সেল গ্রসম্যান ছিল লাজুক অ্যালবার্টের সহপাঠী। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব খুব গভীর ছিল।

সেদিন কলেজ ছিল বন্ধ। গ্রসম্যানের ঘরে বসে অ্যালবার্ট বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছিল।

ঘরের চারধারে অজস্র বই গাদা করা।

আলোচনা করতে করতে অ্যালবার্ট আনমনা হয়ে পড়ছিল।

গ্রসম্যান বুঝতে পারল, অ্যালবার্ট আজ যেন আলোচনায় কিছুতেই মন দিতে পারছে না। আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু এমন ত হয় না। বিজ্ঞানের আলোচনায় অ্যালবার্ট কখনও এমন করে না, সে খুব মন দিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে। তবে কি সে আজ অসুস্থ।

তাই একসময় গ্রসম্যান বলল—থাক, আজ আর আলোচনার দরকার নেই। চল কফি খেয়ে আসি। দু'জনে কফিখানায় ঢুকল।

অ্যালবার্ট কিন্তু তেমনি আনমনা, খাবার খাচ্ছে—কিন্তু খাওয়ার দিকে তার মন নেই। কি যেন সে ভাবছে! আর এই ভাবনার জন্য সে যেন নিজেকে ঠিক মতন গুছিয়ে নিতে পারছে না। বারে বারে

আনমনা হয়ে পড়ছে। কোন এক অজানা রহস্যের সিংহদরজায় তার কিশোর মন বুঝি মাথা কুটছে ঃ ওগো রহস্যময় খোল তোমার অর্গল ! তোমাকে আমি দেখতে চাই। জানতে চাই, বুঝতে চাই। তোমার রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ দিয়ে আমার মন ভরিয়ে নিতে চাই। তুমি আমাকে উৎসাহিত কর। জগতের মানুষকে শোনাতে চাই তোমার বাণী, তোমার কাহিনী। দেখাতে চাই তোমার সত্য রূপ।

—অ্যালবার্ট, আসছে সপ্তাহে ত পরীক্ষা। কেমন তৈরি করলে ?

পরীক্ষা ? কি পড়েছ, কি শিখেছ এই ক'মাসে তারই বিচার হবে। অ্যালবার্ট বলে উঠল—হাঁ, পরীক্ষা হবে তা জানি। কিন্তু আমার ত কিছুই তৈরি হয় নি, গ্রসম্যান ! মনে বড় ভয় হচ্ছে !

—সে কি ! পরীক্ষায় বসবে না ?

—হ্যাঁ ! পরীক্ষায় বসতেই হবে। কিন্তু আমার এসব একদম ভাল লাগে না !

—কি ভাল লাগে না, অ্যালবার্ট ? পরীক্ষা ? কিন্তু পরীক্ষা না দিলে ত তোমার পড়াশুনাই শেষ হবে না !

—তা জানি, গ্রসম্যান ! কিন্তু এই মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগ্‌রে দেওয়ার নিয়ম একদম আমার ভাল লাগে না। পরীক্ষায় কড়াকড়ির জন্যই আমি এবার কলেজ ছেড়ে পালাব ! অ্যালবার্ট বলল এবং বিষণ্নমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

গ্রসম্যান অবাক হল। সাধারণত এত কথা এমন বিষণ্ন মনে বলে না অ্যালবার্ট। কি হল ওর ?

দু'জনে নীরবে কফি পান শেষ করল।

—চলি তাহলে। বিদায় নেওয়ার জন্য বলল অ্যালবার্ট।

গ্রসম্যান বলল—চল আমার ঘরে ! তোমাকে কয়েকটা জিনিস দেখাব।

দুজনেই আবার গ্রসম্যানের ঘরে ফিরে এল।

এবার নিজের নোট খাতাখানা বন্ধুর হাতে দিয়ে গ্রসম্যান বলল—

এখানা তুমি রাখ, অ্যালবার্ট।

—এটা ত তোমার ক্লাশ-নোটের খাতা ?

—হ্যাঁ। তুমি রাখ। পরীক্ষায় তোমার কাজে লাগবে।

গ্রসম্যান সযত্নে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোট টুকে রেখেছে। প্রতিটি বিষয়ের ধারাবাহিক আর সুষ্ঠু আলোচনা রয়েছে। গাদা গাদা বই না পড়লেও চলে। দরকার হবে না পাতার পর পাতা মুখস্থ করার। অ্যালবার্ট বুঝি হাতে স্বর্গ লাভ করল।

নির্ধারিত দিনে পরীক্ষায় বসল অ্যালবার্ট।

আর ভয় নেই তার। গ্রসম্যানের নোট-খাতা তাকে পরীক্ষার উত্তাল সাগর পাড়ি দিতে সাহায্য করবে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল অ্যালবার্ট।

শুধু এই প্রথম বছরের পরীক্ষাই নয়, পলিটেকনিকে চার বছর ধরে এমনিভাবে নোটখাতা দিয়ে গ্রসম্যান তাকে সাহায্য করেছিল। অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনবার দরকার হয় নি অ্যালবার্টের, প্রয়োজন হয় নি কলেজ রুমের চার দেওয়ালের মাঝে নিজেকে আটকে রাখবার। গাদা গাদা বইও মুখস্থ করতে হয়নি। সে সময় পদার্থ-বিদ্যার নানা বই পড়ে আর চিন্তার মহাসাগরে ডুব দিয়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছে অ্যালবার্ট। যে কিশোর আগামী দিনের নতুন পথের আলোর দিশা পেয়েছে সে কি নিরানন্দ কলেজের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখতে পারে ?

একটি একটি করে পলিটেকনিকের সব কটি বেড়া অতিক্রম করে অ্যালবার্ট স্নাতক হল।

অ্যালবার্ট লাভ করল বিজ্ঞানে উপাধি।

পলিটেকনিকে মিলেভা ছিল অ্যালবার্টের সহপাঠিনী।

বেশি কথা না বললেও সে ভাল শ্রোতা ছিল। নীরবে গভীর মনোযোগ দিয়ে মিলেভা অ্যালবার্টের প্রত্যেকটি বক্তব্য শুনত। তাকিয়ে থাকত তার শান্ত লাজুক মুখের দিকে।

দিনের পর দিন এমনি আলোচনার অবসরে দু'টি তরুণ হৃদয় পরস্পরের অন্তরঙ্গ হল।

স্নাতক উপাধি লাভ করার কিছুদিন পরেই অ্যালবার্ট মিলেভাকে বিয়ে করল।

পাঁচ

এবার শুরু হল জীবন সংগ্রাম।

স্যুইস নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল অ্যালবার্ট। এদেশে থাকতে গেলে এবং জীবিকা অর্জন করতে হলে নাগরিক অধিকার পেতে হবে। অ্যালবার্ট বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি লাভ করেছে ঠিকই। কিন্তু কেবল এই একটিমাত্র পরিচয়ে সে এদেশে চাকরি পাবে না। বিদেশী একটি তরুণকে কেউ চাকরি দেবে না।

এই সংসারে ভালবাসা যেমন আছে তেমনি আছে ঘৃণা আর অবহেলা। বড় অকরুণ এই সংসার। আর গোটা ছাত্র-জীবন অ্যালবার্ট মাঝে মাঝে এই ঘৃণা এই অবহেলার রূপ দেখেছে। তার লাজুক মন বিষণ্ন হয়ে উঠেছে—কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি।

বিদেশী তরুণ কার কাছেই বা নিজের দুঃখের, যন্ত্রণার কথা বলবে?

অভিন্ন হৃদয় বন্ধু গ্রসম্যানের কাছে বলবে?

কিন্তু গ্রসম্যানও ত তারই মতন আর এক ছন্নছাড়া তরুণ! স্নাতক উপাধি লাভ করে সেও ত ছুটছে জীবিকা অর্জনের আশায়। বন্ধু অ্যালবার্টকে সাহায্য করার মতন শক্তি তার কোথায়!

একুশ বছরের তরুণ অ্যালবার্ট এখন আর একা নয়···সঙ্গে স্ত্রী মিলেভা।

কিন্তু নির্দিষ্ট জীবিকার কোনও সংস্থান নেই। ছাত্র জীবন শেষ—কাজেই মামার পাঠান একশ' ফ্রাঙ্কের মাসিক সাহায্যও বন্ধ।

পরিবারের অন্য কারো কাছ থেকে যে সে মাসে মাসে আর্থিক সাহায্য পাবে তারও আশা নেই। বড় হয়েছে অ্যালবার্ট। লেখাপড়ার

পাঠ চুকিয়েছে এবার তাকে রোজগার করতে হবে। সুইজারল্যাণ্ডে থাকতে হলে নিজের পায়ে তাকে দাঁড়াতে হবে।

অবশেষে সুইস্ নাগরিক অধিকার লাভ করল অ্যালবার্ট। কিন্তু কোথাও একটা চাকরি পেল না।

তার আশা ছিল, স্নাতক হওয়ার পরই কলেজে কনিষ্ঠ-অধ্যাপকের চাকরিটা সে পাবে। বিজ্ঞানে মেধাবী ছাত্র হিসাবে সে তখন পরিচিত, তার অধ্যাপকেরাও তাকে খানিকটা আশা দিয়ে ছিলেন।

কনিষ্ঠ অধ্যাপকের চাকরিও অ্যালবার্ট পেল না।

মিলেভা আলাদা সংসার গড়ে তোলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু কোথায় চাকরি পাবে অ্যালবার্ট ? সারা সংসার সহসা যেন তাকে বিপদে ফেলবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। সাহায্য বন্ধ। চাকরি নেই। ওদিকে স্ত্রী মিলেভার দায়িত্ব তার উপর।

উনিশ শতক শেষ। এবার শুরু বিশ শতক।

মহাকালের রথখানা একটা শতাব্দী পার হয়ে আর একটা শতাব্দীতে প্রবেশ করল। তার পরিক্রমা পথে সে অনেক ভাঙা-গড়ার ইতিহাস সৃষ্টি করে এসেছে কিন্তু সে ইতিহাস কি শেষ হয়েছে ?

না, হয় নি।

ইউরোপ জুড়ে চলেছে রাজনৈতিক পরিবর্তন। ছোট ছোট রাজ্যগুলো হয় তাদের স্বাধীনতা হারাচ্ছে আর না হয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। বড় রাজ্যগুলো কেবলই দল পাকাচ্ছে। সৃষ্টি রাজনৈতিক সঙ্কট। সব রাজ্যই গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য।

ইউরোপের বুকে তিন প্রধান শক্তি ঃ জারের রাশিয়া, সারা বিশ্ব জোড়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী গ্রেট ব্রটেন আর রণ নিপুণ জার্মানী। শক্তির লড়াই এদের মধ্যেই তীব্র। এরা কেবলই সুযোগ খুঁজছে।

তাই তখন সারা ইউরোপ যেন একটা বারুদের স্তুপ হয়ে ছিল। দরকার শুধু একটা আগুনের ফুলকির।

অ্যালবার্ট বিজ্ঞানের ছাত্র রাজনীতির দিকে কোনও দিন তার মন আকৃষ্ট হয় নি। জার্মানীর তুলনায় ইতালি তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। অফুরন্ত সৌন্দর্যের দেশ ইতালি তার মনে অজস্র উৎসাহ দান করেছিল।

এবারে শুরু হল অ্যালবার্টের উমেদারীর জীবন। একটা চাকরি চাই। চাই বেঁচে থাকার জন্য রোজগার করার পথ। পকেটে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেওয়া স্নাতক উপাধি পত্র। বিজ্ঞানে স্নাতক কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে এসব যে একেবারেই অচল তা বুঝতে পারল অ্যালবার্ট। কোথাও আশার আলো দেখতে পেল না।

—আপনাদের এখানে আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন। লাজুক অ্যালবার্ট ধীরে ধীরে বলে।

—কতদূর পড়াশুনা করেছ ?

ভয়ে ভয়ে অ্যালবার্ট জবাব দেয়—বিজ্ঞানে স্নাতক! এই দেখুন।

অফিসের পরিচালক তার উপাধি পত্র মন দিয়ে দেখে ফেরৎ দেন।

বলেন—না। এখন ত চাকরি খালি নেই। ঠিকানা রেখে যাও। খালি হলে খবর দেব।

প্রথম প্রথম পরিচালকদের এধরণের কথা শুনলে মনে মনে আশার আলো দেখত। হয়ত অফিসে এখন কোনও পদ সত্যিই খালি নেই। খালি হলে খবর দেবে তাকে, নিয়োগ করবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অ্যালবার্ট বুঝতে পারল এটা কথার কথা। চাকরি খালি হলেও কেউ খবর দেয় না। চাকরির উমেদারকে ভদ্রভাবে তাড়াবার জন্য এ সব বলতে হয়।

আর কয়েকটা সংস্থায় ত মুখের উপর সোজাসুজি বলল—না বাপু! চাকরি কোথায় ?

আশা আর নিরাশার আলো-ছায়ার পরিবেশ।

খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন বেরোয়।

অ্যালবার্ট বিজ্ঞাপন পড়ে মন দিয়ে আর মাঝে মাঝে চাকরির জন্যে আবেদন পত্র পাঠায়। এখন আর কাজ নিয়ে সে বাছ বিচার করতে

চায় না। যে কোনও একটা চাকরি হলেই হল। যা পাবে তাই সে করবে। নিয়মিত অর্থ ছাড়া এ-সংসারে সে বাঁচবে কি করে?

বেকার জীবনের বহু দুঃখ, বহু জ্বালা ভোগ করল অ্যালবার্ট। অবশেষে একটা চাকরি পেল সে।

জুরিখের কাছে একটি ছোট কারিগরী বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছুটি নিয়েছিলেন। অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। কর্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখে অ্যালবার্ট দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। সেই পদে সে চাকরি পেল। অধ্যাপকের কাজ। সাময়িক কাজ!

তা হোক! তবু মায়ের আশা বুঝি পূরণ করতে পারল অ্যালবার্ট। এমন শান্ত ছেলে, ও নিশ্চয় অধ্যাপক হবে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পড়াবে।

অধ্যাপনার কাজ সমাজে সবচেয়ে সম্মানের কাজ। অ্যালবার্ট সেই সম্মানের কাজই লাভ করল। সে নিজেও তাই চেয়েছিল। ছাত্র-দের পড়াবে আর নিজেও পড়বে। জ্ঞানের রাজ্যের ত সীমা নেই। নিত্য নবীন অবিষ্কার হচ্ছে। আর মানুষের জানার ইচ্ছা বাড়ছে। মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন বলেছেন : জ্ঞান সাগরের বেলায় তিনি শুধু জ্ঞানের নুড়ি কুড়িয়েছেন। তেমনিভাবে অ্যালবার্টও সারা জীবন নুড়ি কুড়োবেন। না, তার বেশি আশা তিনি করেন না।

কারিগরি বিদ্যালয়টা জুরিখের কাছেই উইণ্টারথার শহরে অবস্থিত। অধ্যাপনার কাজে অ্যালবার্ট অল্পদিনের মধ্যেই দারুণ নাম করে ফেলল।

বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রেরই বয়স তার চেয়ে বেশি। অনেকের আর্থিক অবস্থাও তার চেয়ে অনেক ভাল। তারা দামি পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসে। আর অ্যালবার্ট? আলুথালু অতি সাধারণ পোশাক পরণে, মাথায় অগোছাল চুল। দুচোখে গভীর স্বপ্নের ছায়া।

প্রথম প্রথম কোনও কোনও ছাত্র অ্যালবার্টকে পরিহাস করতে চেষ্টা করত। হয়ত অ্যালবার্ট আপন মনে ক্লাসে ঢুকছে কোনও ছাত্র ব্যাঙ ডেকে উঠল।

অ্যালবার্ট গ্রাহ্যও করে না।

কিংবা হয়ত অ্যালবার্ট পদার্থ বিজ্ঞানের কোনও দুরূহ সূত্র বোঝাচ্ছে কয়েকটা ছাত্র একসঙ্গে মেঝেতে জুতোসুদ্ধ পা ঘষতে শুরু করল। সে এক বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ। ছেলেরা হাসছে। কিন্তু জ্ঞান তাপস অধ্যাপক পড়াচ্ছে—এসব দিকে তার কোনও খেয়াল নেই।

ছাত্ররাই একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হল।

অধ্যাপনার গুণে অ্যালবার্ট সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। যে বিষয় নিয়ে ক্লাসে পড়াতে হবে তা' নিয়ে অ্যালবার্ট নিজেই আগে পড়াশুনা করে নিত, নোট করত। তারপর খুব সহজ ভাষায় স্পষ্টভাবে ছেলেদের বোঝাতে চেষ্টা করত। এবং ছাত্রদের পড়ানোর সময় অন্যদিকে তার একদম খেয়াল থাকত না।

ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে তার ব্যাখ্যা শুনত।

কিন্তু অধ্যাপনার কাজটা ছিল সাময়িক। কাজেই ছাত্রদের কাছ থেকে তরুণ অধ্যাপক অ্যালবার্ট একদিন বিদায় নিয়ে চলে এল।

আবার বেকার অ্যালবার্ট। কি করবে সে? এই ছোট্ট শহর ছেড়ে কি জুরিখে ফিরে যাবে? বিদ্যালয়ের পরিচালকরা অ্যালবার্টের অধ্যাপনার প্রশংসা করলেন কিন্তু তাকে চাকরি দিতে পারলেন না।

দু'টি ছাত্র একদিন বলল—স্যার, আপনার কাছে আমরা পড়ব।

গৃহশিক্ষকের কাজ। অ্যালবার্ট রাজী হল। কিন্তু একাজও বেশিদিন স্থায়ী হল না। অ্যালবার্ট নিজের পছন্দমত সব বিষয়ে ছাত্রদের পড়াতে চাইল, কিন্তু ছাত্ররা তাতে রাজী হল না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মতের গরমিল হল।

গৃহশিক্ষকের কাজও ছাড়তে হল অ্যালবার্টকে।

জুরিখে ফিরে এল অ্যালবার্ট। বেকার, ক্ষুধার্ত অর্থের জন্য। আরও জ্ঞানলাভের জন্য।

এখন প্রয়োজন একটি কাজ। চাকরি। যে কাজ করে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পাবে প্রয়োজনীয় অর্থ। যেমন তেমন একটা কাজ হলেই হল। জুতো সেলাইয়ের কাজ ? হাঁ তাও করতে রাজী অ্যালবার্ট। কাজ নিয়ে সে বাছ বিচার করবে না।

হ্যাঁ, এই হচ্ছে জীবনে প্রকৃত অনুসন্ধান। সত্যের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেমন আজীবন অনুসন্ধান করতে হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় জীবিকা অর্জনের জন্য অনুসন্ধান। অ্যালবার্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অনুসন্ধানই জীবনের মূল ভিত্তি। অনুসন্ধানের স্পৃহাই জীবনে গতির সঞ্চার করে।

মাঝে মাঝে সহপাঠীদের সঙ্গে অ্যালবার্টের দেখা হত।

—এই যে আইনস্টাইন, কেমন আছ ?

লাজুক অ্যালবার্ট ধীরে ধীরে জবাব দিত—ভাল আছি।

—কি করছ এখন ? চাকরি-টাকরি পেয়েছ ?

—না। এখনও কিছু জোগাড় করতে পারি নি। এর বেশি আর কিছু মুখ ফুটে বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

—তোমার মতন মেধাবী ছাত্রের অধ্যাপক হওয়া উচিত।

অ্যালবার্ট তা জানে, বিশ্বাসও করে। কিন্তু কে তাকে অধ্যাপকের কাজ দেবে ?

আর বন্ধুরাই বা তাকে কিভাবে সাহায্য করবে ? ওরা ত সবাই ধনী বা সমাজে প্রভাবশালী নয়। তাই ওদের কাছে দুঃখের কথা বলে কি ফল হবে ? না, অ্যালবার্ট ওভাবে চাকরি ভিক্ষা করতে পারবে না।

অ্যালবার্ট জুরিখে ফিরে এসেছে শুনে মার্সেল গ্রসম্যান দেখা করতে এল। বন্ধুর আর্থিক দুরবস্থার কথা সে সব শুনেছে। তাই এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে।

গ্রসম্যানের বাবা সরকারি দফতরের একজন প্রভাবশালী অফিসার। বাবাকে অ্যালবার্টের কথা বলেছে গ্রসম্যান। তিনি রাজধানী বার্নের পেটেন্ট অফিসে অ্যালবার্টের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন।

—তোমাকে একবার বার্নে যেতে হবে অ্যালবার্ট।

—কেন? বার্নে কেন যাব?

—ওখানে পেটেণ্ট অফিসে তোমার ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বাবা।

অ্যালবার্টের মনে আশার ঝিলিক ঝলসে উঠল। কিন্তু ওর আর্থিক অবস্থা এখন খুবই সঙীন। রাজধানীতে যাতায়াতের থাকা-খাওয়ার খরচ সে কোথায় পাবে? অথচ মুখ ফুটে বন্ধুর কাছে সে কথা বলতেও পারছে না অ্যালবার্ট। তাই চুপ করে রইল।

—কি, যাবে না? অধ্যাপনা ছাড়া আর কোনও কাজ করবার ইচ্ছে নেই বুঝি?

অ্যালবার্ট এবার তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না, না। চাকরি নিয়ে বাছবিচার করবার মতন মনের অবস্থা আমার নেই গ্রসম্যান।

—তবে! কালই বার্নে চলে যাও। বাবা বলে দিয়েছেন।

—কিন্তু……আর বলতে পারল না অ্যালবার্ট।

গ্রসম্যান বন্ধুর অবস্থা বুঝল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। অভিমানী অ্যালবার্ট মনে দারুণ আঘাত পেতে পারে। নীরবে পকেট থেকে অনেকগুলো নোট বার করে বন্ধুর হাতে গুঁজে দিল গ্রসম্যান। বলল কাল সকালে তৈরি হয়ে থেক। তোমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

জুরিখ থেকে বার্নে হাজির হল অ্যালবার্ট।

পেটেণ্ট অফিসের পরিচালক হলার সাহেব অ্যালবার্টকে দেখে অবাক হলেন।

অগোছাল সাধারণ পোশাক পরা এই যুবক কি ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে! চাকরির উমেদারীর জন্য যারা ইণ্টারভিউ দিতে আসে তারা ত এমন হয় না। তারা অনেক বেশি চটপটে, চালাক আর ছিমছাম হয়। কিন্তু অ্যালবার্টকে দেখে তেমন মনেই হয় না। অথচ এই যুবক বিজ্ঞানে একজন মেধাবী ছাত্র।

পরিচালক হলার জিজ্ঞাসা করলেন—পেটেন্ট সম্বন্ধে কিছু জানেন।

অ্যালবার্ট ধীরে ধীরে জবাব দিল—না, একেবারেই কিছু জানি না।

জবাব শুনে পরিচালক হলার আরও অবাক হলেন। মনে সন্দেহ হল যুবক এখানে কেন এসেছে। সত্যিই কি সে চাকরি চায়। যদি চাকরি চায় তবে ওর চলনে বলনে তার পরিচয় নেই কেন? মাথায় ছিট নেই ত? না তাও ত মনে হচ্ছে না। বড় শান্ত যুবক। তাকে ভাল লাগল পরিচালকের।

তাকে বিমুখ করতে পারলেন না তিনি।

বললেন—বেশ, আমি চাকরি দেব।

অ্যালবার্টের শান্ত মুখমণ্ডলে খুশির ছোঁয়া লাগল।

—দেখুন, যাঁরা পেটেন্ট নেওয়ার জন্য এই অফিসে আবেদন করেন তাঁরা নানারকম বৈজ্ঞানিক চার্ট এবং টুকিটাকি টেকনিক্যাল বিষয় লিখে পাঠান। সে সব দেখে যদি মনে হয় যে, প্রস্তাবটি খুব কাজের হবে তাহলে নন্‌-টেকনিক্যাল ভাষায় সেই আবেদন পত্রখানা আবার লিখতে হবে। এ ধরনের কাজ কি করতে পারবেন মিস্টার আইনস্টাইন?

অ্যালবার্ট অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারল না।

তার নীরবতা পরিচালক হলারকে বিচলিত করল বুঝি বিরক্ত হলেন কিছুটা। কিন্তু কিছু বললেন না।

অবশেষে অ্যালবার্ট ধীরে ধীরে বলল—হ্যাঁ, পারব।

এবার খুশি হলেন পরিচালক। একটু নিশ্চিন্তও হলেন। মিস্টার গ্রসম্যানকে তিনি কথা দিয়েছেন, সম্ভব হলে যুবককে তিনি চাকরি দেবেন। অ্যালবার্ট সরাসরি যদি জবাব দিত যে, সে পারবে না। তাহলে তিনি তার জন্যে কিছুই করতে পারতেন না।

পরিচালক হলার বললেন—আরও কয়েকটা বিষয় জানবার আছে!

—বেশ বলুন! জবাব দিল অ্যালবার্ট।

—সেগুলো সঠিক জবাব পেলে আপনাকে এই চাকরি দেওয়া

সম্ভব হবে।

কি জানতে চান পরিচালক মশাই ? অ্যালবার্ট নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

—মিস্টার আইনস্টাইন, আপনি কি স্যুইস নাগরিক ?

—হ্যাঁ। অ্যালবার্ট নিজের পরিচয় পত্রখানা দেখাল।

পরিচালক আনন্দিত হলেন। বললেন—বেশ ! আপনি বছরে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক পাবেন।

অবাক হল অ্যালবার্ট। এত অর্থ সে পাবে!

—হবে ত ? আবার জানতে চাইলেন পরিচালক।

—ধন্যবাদ।

জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত তরুণ বিজ্ঞান সাধকের কাছে এমন প্রস্তাব অভাবনীয়।

উত্তেজনায়, আনন্দে মনে মনে অধীর হলেও অ্যালবার্ট শান্তভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করল।

ছয়

বছরে তিন হাজার ফ্রাঙ্কের চাকরি।

তরুণ বিজ্ঞান সাধক এবার নতুনভাবে জীবন শুরু করলেন। শৈশব এবং কৈশোরের দুঃখভরা জীবনের শেষ হল। ওগুলো এখন কেবল স্মৃতি, যেন দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। নবীন জীবনের দরজা পার হয়ে এক বিচিত্র জগতে তিনি প্রবেশ করলেন।

বার্ন শহরে একখানা ছোট বাসা ভাড়া করলেন অ্যালবার্ট। মিলেভাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার গুছিয়ে নিলেন। সরল আসবাবে সাজানো ঘর সংসার। দোতলায় বসবার ঘর। জানালা খুললেই চোখে পড়ে বরফ-ঢাকা আল্‌পসের সুউচ্চ শিখর। নীচে উচ্ছল পাহাড়ী নদীর জলে ঝলমলে রোদের খেলা। অজস্র জানা অজানা ফুলের রঙবেরঙ পরিবেশ।

মন আনন্দে ভরে আসে।

পেটেণ্ট অফিসের কাজ অ্যালবার্টের খুব ভাল লাগল। অবসর সময়ে পদার্থবিজ্ঞানের নানা বই পড়তে লাগলেন।

টেবিলের ড্রয়ারে একখানা ফাইল রেখে দিয়েছিলেন, যে সব বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন তার ফলাফল সেই ফাইলে লিখে রাখতেন। অতি গোপনে তিনি এমনি ভাবে বিজ্ঞানের সাধনায় রত হলেন।

পেটেণ্ট অফিসে অ্যালবার্টের তিনজন সহকর্মী ছিলেন। তাঁরাও ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের নানা সমস্যা নিয়ে অ্যালবার্ট সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতেন।

এ সময়ের নামকরা একজন বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তিনি একজন জার্মান।

সেটা উনিশ শ' সাল।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এতদিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোককণার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস প্রচারিত ছিল তার বিরোধী ছিল ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের এই মতবাদ। বৈজ্ঞানিক চিন্তার জগতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে আলোচনার ঝড় উঠল।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়ানটাম থিওরিতে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করলেন।

কোয়াণ্টা কথাটির অর্থ কণিকাগুচ্ছ। অর্থাৎ আলোককণিকা-গুচ্ছের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ। তিনি লিখলেন : আলোক শক্তির অবিচ্ছিন্ন কোনও প্রবাহ-ধারার অস্তিত্ব নেই। আলোক এক ধরনের শক্তি এবং এই শক্তি গুচ্ছ গুচ্ছ কণিকার মতন বিচ্ছিন্ন ধারায় বিকিরিত হয়। কিন্তু এই কণিকা গুচ্ছগুলো যে কিভাবে সঞ্চালিত হয় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কোয়াণ্টামবাদে তা ব্যাখ্যা করলেন না।

প্ল্যাঙ্কের মতবাদ যখন বিজ্ঞান জগতে সাড়া জাগিয়েছে ঠিক তখনই

আইনস্টাইন স্নাতক উপাধি লাভ করে সবে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন। শুরু করেছেন জীবন সংগ্রাম। প্ল্যাঙ্কের মতবাদ তরুণ বিজ্ঞান সাধকের মনেও দোলা দিয়েছে।

আলোককণিকাগুচ্ছরা কেন অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিকিরিত হয় না? কোন জাগতিক নিয়ম তাদের সঞ্চালনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে? এই নিয়ম ভাঙারও নিশ্চয় একটা নিয়ম আছে। কেননা এই জগৎ হচ্ছে নিয়মের রাজত্ব। এও একটা নিয়ম। একটা সত্য নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে কোথাও। বিজ্ঞানীরা সেই সত্য এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি।

এই অজানাকে জানতে হবে........আলোককণিকাগুচ্ছদের এই রহস্যময় বিকিরণের সত্য জানতে হবে, জানাতে হবে।

পেটেন্ট অফিসের কাজের অবসরে আইনস্টাইন আলোকের ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। সূর্য সৌর জগতের আলোকের উৎস। মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলোকরশ্মি বিকিরিত হচ্ছে। এই আলোকের কণিকাগুচ্ছগুলোর ধারাও কি অবিছিন্ন নয়। মহাশূন্যে এই সঞ্চালন কোন নিয়মে চলছে? বিভিন্ন বস্তুর উপর যখন আলোক শক্তি প্রতিফলিত হচ্ছে তখন যে কণিকা-গুচ্ছগুলো সৃষ্ট হচ্ছে তারাই বা কোন নিয়মে বিকিরিত হচ্ছে?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন তরুণ বিজ্ঞানীকে চঞ্চল করে তোলে।

একটা সময় ছিল যখন জীবিকা অর্জনের জন্য চাকরির অনুসন্ধান করছিলেন আইনস্টাইন। চাকরির অনুসন্ধান-কাল শেষ হয়েছে এতদিনে। এখন আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধানে রত। তাঁর কাছে অনুসন্ধানই জীবন।

আইনস্টাইন এখন নতুন মানুষ। জাগতিক সুখ সুবিধের দিকে তাঁর নজর নেই।

বিশ শতক এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে।

সেটা উনিশ শ' পাঁচ সাল।

বার্নের বাসা বাড়িতে আইনস্টাইনের পরিবারে নতুন দু'টি অতিথির আগমন হয়েছে।

অ্যালবার্টের দুই শিশু পুত্র কল-কল ধ্বনিতে ভরে তুলেছে বাসা-বাড়ি। বিজ্ঞান-সাধকের স্নেহধারা উপচে পড়ছে দুই শিশু পুত্রের উপর। ছুটির দিনে ওদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন অ্যালবার্ট। লেকের ধারে পার্কের মধ্যে কিংবা শহর ছাড়িয়ে। মিলেভা কোনদিন সঙ্গে থাকতেন আবার কোনদিন থাকতেন না।

বড় ছেলেটি অজস্র প্রশ্ন করত। তার শিশু দৃষ্টি নতুন নতুন গাছ-গাছড়া আর পাখ-পাখালি দেখত অবাক হত, খুশিতে উজ্জ্বল হত, আর জানতে চাইত—ওটা কি?

ওটা কি?

শিশু অ্যালবার্টও ত এমনিভাবে একদিন জানতে চাইতেন! সেই জানার জন্য অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানই ত জীবন।

ছেলেদের নিয়ে বেড়াতেন অ্যালবার্ট, কিন্তু তার মন ডুবে থাকত চিন্তার মহাসাগরে।

জুন মাসের এক সকাল।

তরুণ বিজ্ঞান-সাধক আপন মনে হাঁটছেন রাস্তা দিয়ে। হাতে একখানা মোটা খাম। তার ভিতরে রয়েছে ত্রিশখানা হাতে লেখা কাগজ, একখানা পাণ্ডুলিপি। এই ক বছরে সত্যের অনুসন্ধানে রত বিজ্ঞান সাধক যা কিছু ভেবেছেন তাই ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধের আকারে লিখেছেন।

খামখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। যাক এবার কিছুদিনের জন্য ছুটি।

ওই পাণ্ডুলিপি পাঠালেন লিপজিগ শহরের বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা আনালেন ডার ফিজিক (Annalen der physik)-এর সম্পাদকের কাছে। প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট লাগানো আছে।

পাণ্ডুলিপি ঠিক সম্পাদকের কাছে পৌঁছে যাবে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। অবসন্ন দেহ নিয়ে আইনস্টাইন ঘর-মুখো হাঁটতে লাগলেন।

আলোককণিকগুচ্ছ সমূহের সঞ্চালন পথ সম্পর্কে বিগত কয়েক বছর ধরে পড়াশুনা করেছেন, চিন্তা করেছেন আইনস্টাইন। একটা সত্যও তিনি নির্ধারণ করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর সত্য ধারণার। কেবল আলোকশক্তি নয় তাপ এবং রঞ্জন রশ্মিও ভারহীন কণিকাগুচ্ছের ধারায় প্রবাহিত হয়। আলোকশক্তির মধ্যে মানুষ বিভিন্ন রঙের বিকাশ দেখে কেন? এই বর্ণালী কে সৃষ্টি করে? আলোককণিকার সাথে চোখের ভিতরকার অপটিক নার্ভের অদৃশ্য সংগ্রাম চলে, তারই প্রতিক্রিয়ার ফল মানুষের দর্শন অনুভূতি, মানুষ দেখে বর্ণালীর সমারোহ, আইনস্টাইন এই প্রতিক্রিয়ার নামকরণ করলেন আলোক বৈদ্যুতিক ফল।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ধারণ করলেই বিজ্ঞানীর সব কাজ শেষ হয় না। জটিল সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা করতে হবে। সর্বজন গ্রাহ্য হতে হবে।

এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, কোনও ধাতব পাতের উপর আলোকরশ্মি পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন বা ঋণাত্মক তড়িৎকণা নির্গত হয়। আলোকতরঙ্গ সম্পর্কে এটাই মূলকথা। কিন্তু আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করলেন : বিকিরিত আলোকশক্তি কণিকার আঘাতে ধাতব পাতের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বা ঋণাত্মক কণা নির্গত হয় এবং এই আলো শক্তির অবিচ্ছিন্ন ধারায় গঠিত বা সঞ্চালিত নয়…এই আলো একটি বা একাধিক কণিকাগুচ্ছের বিচ্ছিন্ন ধারায় বিকিরিত হয়। এক বা একাধিক কণিকাগুচ্ছ যখন ধাতব পাতের ঋণাত্মক কণাকে আঘাত করে তখন সৃষ্টি হয় পারস্পারিক আঘাত।

আইনস্টাইন এই শক্তি কণিকাদের নামকরণ করলেন : ফোটন।

কিন্তু আলোক কণিকাগুচ্ছের সংখ্যা কত হবে?

উনি ব্যাখ্যা করলেন। আলোর আঘাতে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা আলোর উজ্জ্বলতার উপর নির্ভরশীল নয়। আলোর রঙের বিশিষ্টতার উপর ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ভর করে। আর নির্গত ইলেকট্রনের গতি নির্ভর করে আঘাতকারী ফোটনের শক্তির উপর।

অবশেষে অ্যালবার্টের প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।

তাঁর মতবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করল বিজ্ঞানী মহলে।

লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন—সারা ইউরোপের বিভিন্ন শহরের বিজ্ঞানীরা অবাক বিস্ময়ে তাঁর প্রবন্ধগুলো পড়লেন। এ এক বৈপ্লবিক মতবাদ। পদার্থ বিজ্ঞানীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে আলোকের গতি রহস্যের সমাধান হল। তাঁরা অধীর হয়ে জানতে চাইলেন—কে এই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন? কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তিনি? আর কোথায় বা তিনি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন করছেন? মিউনিখে? জুরিখে? বার্নে? না কি সোরবর্নে? কিন্তু না, কোনও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ত তাঁর নাম জড়িয়ে নেই? এত বড় প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর নাম ত তাঁরা আগে কখনও শোনেন নি?

সারা ইউরোপে আইনস্টাইনের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

একটি আবিষ্কারেই তিনি বিশ্বখ্যাত নাম।

আইনস্টাইন যে পেটেণ্ট অফিসের একজন সামান্য কর্মচারী তা বিজ্ঞানী মহল কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁরা ভাবেন নি যে, এই যুগান্তকারী মতবাদের প্রবক্তা অফিসের কাজের অবসরে বিজ্ঞানের সাধনায় রত থাকেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক ম্যাক্স ভন লাউ। তিনিও কোয়াণ্টামবাদ নিয়ে পড়াশুনা আর বিশ্লেষণ করছিলেন। অ্যালবার্টের মতবাদ তিনি পড়লেন। তিনি সব বিষয়ে অ্যালবার্টের মত মেনে নিতে পারলেন না। বিজ্ঞানীর সাথে মুখোমুখি আলোচনা করবেন ঠিক করলেন।

একদিন ম্যাক্স ভন লাউ যাত্রা করলেন বার্নের দিকে।

তরুণ অ্যালবার্টকে দেখে জার্মান অধ্যাপক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

বললেন—আপনার মতবাদ নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই, মিস্টার আইনস্টাইন।

লাজুক অ্যালবার্ট ধীরে ধীরে আলোচনা করতে লাগলেন।

একজন প্রবীণ এবং আর একজন তরুণ বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানের জগতে বয়স এবং অভিজ্ঞতাই বড় জিনিস নয়। বড় হচ্ছে মেধা এবং প্রতিভা যা সহজাত বস্তু। যে প্রতিভাধর সে আপনশক্তিতে পরিচিত হয়। তাই বিজ্ঞানীর মধ্যে প্রতিভার দীপ্তি দেখে প্রবীণ বিজ্ঞানী খুশি হলেন, মুগ্ধ হলেন।

কয়েক মাস পরে অস্ট্রিয়ার স্যালসবার্গ শহরে সারা ইউরোপের বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সেখানে নিমন্ত্রিত হলেন। এবং নিমন্ত্রিত হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বিজ্ঞানীরা অ্যালবার্টের ব্যাখ্যা শুনতে চান।

এই নিমন্ত্রণ অ্যালবার্ট প্রত্যাখ্যান করলেন না।

তিনি স্যালসবার্গের সম্মেলনে হাজির হলেন।

সেই আপনভোলা বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট। পরণে সাধারণ পোশাক, মাথায় এক মাথা বড় বড় কালো চুল, চলনে বলনে শান্ত। সম্মেলনের বক্তৃতামঞ্চে উঠলেন অ্যালবার্ট।

উপস্থিত বিজ্ঞানীরা অবাক হলেন।

সেদিন নিজের মতবাদের ব্যাখ্যায় অ্যালবার্ট বিজ্ঞানী মহলকে খুশি করলেন। কিন্তু জীবিকার্জনের পথ সরল হল না, তাই বার্নে ফিরেই আবার তিনি চাকরিতে ফিরে গেলেন। সহকর্মীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম তখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইউরোপের দেশে দেশে তাঁর মতবাদ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মানুষ অ্যালবার্ট এবং তাঁর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কেও আলোচনা হচ্ছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এক ইহুদি পরিবারের সন্তান আজ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। দুঃখ-দারিদ্র্যের সাথে অহরহ সংগ্রাম করে তিনি পড়াশুনা করেছেন। আর্থিক অনটন তাঁর নিত্য-সঙ্গী। যাযাবরের মতন মিউনিখ থেকে মিলান আবার মিলান থেকে জুরিখ ছুটেছেন এবং আজও জীবিকার জন্য সরকারি পেটেন্ট অফিসে কাজ করছেন।

কোনও বিশ্ববিদ্যালয়, কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে একটা সামান্য অধ্যাপকের কাজ দেয় নি। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকরা গভীর লজ্জা অনুভব করলেন।

এত বড় প্রতিভাধর বিজ্ঞানী স্যুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক। এখানকার পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিজের প্রচেষ্টায় বড় হয়েছেন, হয়েছেন বিশ্বখ্যাত। এখনও যদি তিনি জীবিকার জন্য পেটেন্ট অফিসের কেরানীর পদে কাজ করতে বাধ্য হন তাহলে সেটা হবে সমগ্র স্যুইস জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। যে বিজ্ঞানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার কথা তিনি থাকবেন কেরানী হয়ে! এ কি বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে না?

আইনস্টাইন অবশ্য জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন...তবে তিনি জাতির কাছে গর্বের!

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকরা স্থির করলেন যে, আইনস্টাইনকে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ দেওয়া হবে।

একটা সুযোগও সে সময় সৃষ্টি হল।

পদার্থ-বিভাগের সভাপতি ডক্টর ক্লীনার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানালেন।

অ্যালবার্ট চিন্তিত হলেন। তিনি কোনও বড় পদ চান না, চান না অজস্র অর্থ অথবা সম্মান। নীরবে বিজ্ঞানের সাধনায় রত থাকাই

তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাঁর আপেক্ষিকবাদ নিয়ে খুব আলোচনা করছেন...কিন্তু তিনি সে সব আলোচনা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি যেন সব কিছুর নীরব দর্শক। তাই অধ্যাপকের পদ গ্রহণে তিনি রাজী হতে চাইলেন না। পেটেণ্ট অফিসের চাকরি তাঁর কাছে যেন বেশি কাম্য।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ পাওয়ার পথেও একটা নিয়ম-ঘটিত বাধা দেখা দিল।

অধ্যাপক হতে হলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সহকারী লেকচারার হতে হয়। কিন্তু অ্যালবার্ট ত লেকচারার নন, কেরানী। এবং এ ধরনের সহকারী লেকচারারদের বিশ্ববিদ্যালয় কোনও বেতন দেয় না। যে সব ছাত্র বক্তৃতা শুনবে তাদের দেওয়া অর্থে লেকচারারদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

কিন্তু সহকারী লেকচারার হওয়ার ইচ্ছা হল না অ্যালবার্টের।

তিনি পেটেণ্ট অফিসের চাকরি করতে লাগলেন।

অবশেষে বার্ন বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালবার্টকে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাল।

পরিচালক-মণ্ডলী জানালেন—বেশ ত, কিছু সময়ের জন্য আপনি অধ্যাপক হন। তাহলে আপনাকে সরকারি চাকরি ছাড়তে হবে না। ছাত্রদের পড়াতে পারবেন।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ও জানাল—আপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পদ খালি রাখবে।

এবার অ্যালবার্ট রাজী হলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পড়ানোর একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালবার্টের দু'টি ছাত্র হল।

তাদের কাছে অ্যালবার্ট বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতেন। তিনি যে আপেক্ষিকবাদের কথা বিজ্ঞানীদের শুনিয়েছেন তা নিয়ে গভীর আলোচনায় ডুবে থাকতেন।

স্যার আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষবাদের কথা বিজ্ঞানীদের শুনিয়েছিলেন : এই বিশ্বে মহাকর্ষ এক অদৃশ্য শক্তি। যে কোন দুই বস্তু এই বিশ্বে পরস্পর পরস্পরকে সমান ও বিপরীত মুখী শক্তিতে অহরহ আকর্ষণ করছে। আর এই মহাকর্ষ শক্তির জন্যই মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্রগুলি অবিরাম আপন আপন কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। তারা কক্ষপথ থেকে খসে পড়ছে না, তাদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হচ্ছে না। মহাকর্ষশক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে এই মহাবিশ্বের গতিধারা।

কিন্তু আইনস্টাইন বললেন নতুন কথা।

মহাকর্ষ আসলে কোনও শক্তি নয়। মহাশূন্যে কোন বস্তুর অবস্থানের জন্য একটা বক্রক্ষেত্র বা মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। বস্তু পিণ্ডটি সেই মহাকর্ষ ক্ষেত্র বরাবর অবিরাম ঘুরতে থাকে। চুম্বকের ক্ষেত্রে যেমন অগণিত শক্তির রেখা তাকে কেন্দ্র করে তার চারধারে ছড়িয়ে থাকে। সেইটি হয় তার আকর্ষণ ক্ষেত্র। মহাকর্ষ ক্ষেত্রও অমনিভাবে মহাশূন্যে এক একটা গ্রহ বা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে থাকে। গ্রহ বা নক্ষত্রগুলির মধ্যে যার ভর যত বেশি তার মহাকর্ষ ক্ষেত্রও তত জোরালো।

ছাত্ররা অবাক বিস্ময়ে এই তরুণ অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনে।

অ্যালবার্ট আবার বলেন : আর তাই সূর্যের আকর্ষণ পৃথিবীর থেকে যেমন বেশি তেমনি পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদের চেয়ে বেশি। আর তা হয়েছে এদের মধ্যে ভরের পার্থক্যের জন্য।

অবশেষে একদিন নিয়ম রক্ষার জন্য অধ্যাপনার কাল শেষ হল।

এখার তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারেন। আর কোনও বাধা নেই।

আইনস্টাইন সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক হলেন।

তখনও অ্যালবার্টের বয়স ত্রিশের কোঠা স্পর্শ করে নি।

অধ্যাপক হলেন অ্যালবার্ট।

পলিন আইনস্টাইন প্রায়ই বলতেন, তাঁর ছেলে একদিন অধ্যাপক হবে। এটাই ছিল তাঁর জীবনে বড় সাধ স্বপ্ন। সংসারে সবাই যখন ভয় পেয়ে ভেবেছে, অ্যালবার্ট বড় ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে, বোকা। ওর লেখাপড়া হবে না। আর কাজকর্ম কিছুই করতে শিখবে না। মা কিন্তু তখন স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর ছেলে বড় হয়ে ছাত্রদের পড়াবে।

মায়ের মনের সাধ অ্যালবার্টকে উৎসাহিত করত।

তাই অধ্যাপক আইনস্টাইন মাকে লিখলেন—মাগো তোমার মুখচোরা ছেলে এতদিনে বড় হয়েছে, অধ্যাপক হয়েছে।

মায়ের মনের আশা তিনি সফল করতে পেরেছেন, তাই নিজেও তিনি আনন্দিত।

পরবর্তীকালে একজন সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

—আপনি কোন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন ?

আইনস্টাইন মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—আমার মাথাই ল্যাবরেটরি।

সরকারি দপ্তরে কেরানী আইনস্টাইনের কাছে বিজ্ঞানের চিন্তা ছিল শখ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক আইনস্টাইনের কাছে বিজ্ঞানের চিন্তা আর শখ নয়, ওটাই তাঁর দৈনন্দিন কাজ। তাঁর ধ্যান ধারণার কথা তিনি ছাত্রদের কাছে বলেন।

অন্য অধ্যাপকদের সঙ্গেও আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

জুরিখে আবার ফিরে আসার সুযোগ পেয়ে সব চেয়ে খুশি হলেন মিলেভা।

অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ায় তাঁদের সামাজিক পদ-মর্যাদা বাড়ল। জীবনে এবং সমাজে চাহিদা বাড়ল। এখন আর থাকবার জন্যে ছোট বাড়ি হলে চলবে না, বড় বাড়ি চাই। আরামে আর মর্যাদা বজায় রেখে সমাজে থাকতে হলে চাই অনেক আসবাবপত্র।

পেটেণ্ট অফিসের কেরানী অ্যালবার্ট যে মাস মাহিনা পেতেন অধ্যাপকের মাহিনা তার চেয়ে সামান্য বেশি ছিল। কিন্তু খরচ বাড়ল সে তুলনায় অনেক বেশি। খরচে কুলোত না।

পদমর্যাদা নিয়ে অ্যালবার্ট মাথা ঘামাতেন না। ধোপদুরস্ত পোশাকের দিকেও তাঁর কোনদিন নজর ছিল না। অ্যালবার্টের এ ধরনের অগোছাল স্বভাবের জন্য মিলেভা অখুশি হতেন। প্রায়ই তিনি অ্যালবার্টকে কথা শোনাতেন।

—এখন আর তুমি কেরানী নও, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তুমি। নিজের পোশাক আশাকের দিকে নজর দাও।

—কেন, এই ত বেশ পোশাক!

—বেশ, না ছাই। অমন পোশাক ভিখিরীও ছোঁবে না।

আপনভোলা বিজ্ঞানী ওসব কথায় কান দিতেন না।

তাঁর আপেক্ষিক মতবাদ নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে বিতর্কের ঝড় বইছে।

নূতন মতবাদ যেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একখানা ঘরের কাঠামো। এখনও তার পরিপূর্ণ চেহারা গড়ে ওঠে নি। নানা সিদ্ধান্ত প্রমাণ এবং সূত্র যোগ করে সেই কাঠামোর উপর প্রাসাদ গড়ে তুলতে হবে। তখন কেবল বিজ্ঞানীরা নন, সাধারণ মানুষের কাছেও তাঁর মতবাদ সহজবোধ্য হবে। কিন্তু কে গড়ে তুলবে সেই প্রাসাদ? চিন্তা আর সাধনা দ্বারা অ্যালবার্টকে তাঁর নিজের সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। তাই সময় চাই অ্যালবার্টের···আরও অবসর সময়।

মাঝে মাঝে ইউরোপের নানা শহরের বিজ্ঞান মণ্ডলী অ্যালবার্টকে বক্তৃতা করতে নিমন্ত্রণ জানাতেন। নূতন মতবাদ নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতে চান। আবিষ্কারকের কাছ থেকে মতবাদের ব্যাখ্যা শুনতে চান।

এসব সভায় যাতায়াতের জন্য দীর্ঘ সময় লাগত।

যে শহরেই অ্যালবার্ট বক্তৃতা দিতে যেতেন সেখানেই পণ্ডিত ও

বিজ্ঞান সাধকরা তাঁর বক্তৃতা শুনতে সভায় হাজির হতেন। এই তরুণ বিজ্ঞানীর যুক্তি তাঁদের মন অভিভূত করে ফেলত। সবাই একাগ্র মনে আইনস্টাইনের কথা শুনতেন।

প্যারীর সভায় মাদাম কুরী হাজির ছিলেন।

আইনস্টাইনের বক্তৃতা শুনে মাদাম কুরী খুশি হয়ে বলেছেন: বিজ্ঞানের জগতে এক তরুণ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে।

ব্রাসেলস নগরীর সভায় আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হল অধ্যাপক ম্যাকস প্ল্যাঙ্কের।

কণিকাগুচ্ছ মতবাদের স্রষ্টা বিজ্ঞানী ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক। তাঁর আবিষ্কারের ফলে সেদিন বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আইনস্টাইন কণিকাগুচ্ছের মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানী-মহলকে শুনিয়েছেন আপেক্ষিকতাবাদের কথা।

অভিজাত জার্মান অধ্যাপক ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক সভায় বসে আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা শুনলেন। খুশি হলেন। কণিকাগুচ্ছের মতবাদকে পেছনে ফেলে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন আইনস্টাইন। ভারি ভাল লাগল এই আপনভোলা তরুণ বিজ্ঞানীকে। পোশাকে চেহারায়, কথাবার্তায় অতি সাধারণ মানুষ আইনস্টাইন। বংশের আভিজাত্য নেই তবে আছে প্রতিভার আভিজাত্য।

দু'জনে আলোচনায় বসলেন।

ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক জানতে চাইলেন—গতিশীল বস্তুপিণ্ড যদি আলোকের মতন গতিশীল হয়ে ওঠে তবে তার ভর হবে অমেয় ?

—হ্যাঁ, তার ভর বহুগুণ বর্ধিত হবে। কারণ বস্তুই শক্তি, শক্তিই বস্তু। বস্তু হল শক্তিরই ঘনীভূত রূপ।

— তাহলে সব বস্তুপিণ্ডের মধ্যেই শক্তি ঘনীভূত হয়ে রয়েছে ?

আইনস্টাইন ধীরে ধীরে বললেন—ঠিক তাই। এক কিলোগ্রাম কয়লাকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হয় তবে আড়াইশো কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি হবে। নক্ষত্র

এবং সূর্যের দেহে এমনিভাবে অহরহ বস্তুপিণ্ড থেকে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

চিন্তার জগতে ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সতীর্থ।

তাই মুখোমুখি বসে আলোচনা করে তাঁরা খুশি হলেন।

সারা বিশ্বের বিজ্ঞান সমাজ আইনস্টাইন সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

জুরিখে অধ্যাপনা করছিলেন অ্যালবার্ট।

এবার আমন্ত্রণ এল প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সহকারী অধ্যাপকের পদ নয়, তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে প্রধান অধ্যাপকের পদ দিতে চাইল প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। নামকরা পণ্ডিতরা এখানে ছাত্রদের পড়ান। দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে।

অ্যালবার্ট প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

প্রধান অধ্যাপক হলে তিনি পড়াশুনা করার বহু সুযোগ এবং অবসর পাবেন এবং পাবেন চিন্তা করার অনেক সময়। বিজ্ঞান সাধনায় আর ছেদ পড়বে না।

প্রাগ ইউরোপের একটা প্রাচীন শহর। আইনস্টাইন প্রাগে চলে এলেন। সঙ্গে মিলেভা এবং ছেলেরা।

অধ্যাপকের চিন্তামগ্ন অবস্থা দেখলে ছাত্ররা আর তাঁকে বিরক্ত করত না। মাঝে মাঝে অ্যালবার্ট ছাত্রদের বলতেন—দেখ, তোমরা বুঝতে না পারলে আমাকে জিজ্ঞাসা কর।

—কিন্তু স্যার…। ছাত্ররা বলতে চাইলেও বলতে পারে না।

অ্যালবার্ট ছাত্রদের মনের ভাব বুঝতে পারেন। বলেন—আমার মস্তিষ্ক একটা পরীক্ষাগার। ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমার মন অধীর হয়ে থাকে, তোমাদের সঙ্গ করেই আমি ওখানে ফিরে যাই। একমনে কাজ করি।

পরীক্ষাগার! হ্যাঁ, অ্যালবার্টের মস্তিষ্ক একটা চিন্তার পরীক্ষাগার।

ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ এল অ্যালবার্টের কাছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালবার্টকে নিয়োগ করতে চাইল। বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা এবং অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অ্যালবার্ট সকলের কাছে প্রিয়। অধ্যাপকরা, ছাত্ররা সকলেই তাঁকে নিজেদের মধ্যে চাইছিল।

অ্যালবার্ট আর নতুন করে বদলি হতে চান না।

তাতে সুস্থির হয়ে চিন্তা করার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া ভাল নয়।

অ্যালবার্ট মনে-প্রাণে বিজ্ঞান-সাধক। বৈজ্ঞানিক বিষয় ছাড়া আর যে বিষয়ে তাঁর মন মাঝে মাঝে আকৃষ্ট হয় তা হচ্ছে সঙ্গীত। রাজনীতি সম্পর্কে জানতে তাঁর মনে কোনও আগ্রহ নেই। ছোটবেলা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে তিনি বাস করেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন—এখনও বিজ্ঞান-সাধক হিসাবে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইউরোপের একজন প্রখ্যাত মানুষ অ্যালবার্ট।

রাজনীতির আবিলতা থেকে তিনি দূরে থাকতে চান।

এমন দিনে আবার আমন্ত্রণ এল অ্যালবার্টের কাছে।

এবার আমন্ত্রণ জানাল জুরিখের পলিটেকনিক স্কুল। অ্যালবার্টকে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ দেওয়া হবে। এই স্কুলেই পড়াশুনা করেছেন অ্যালবার্ট—এখান থেকেই স্নাতক হয়েছেন। তাই এখানকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য মনে মনে তিনি খুব অস্থির হলেন। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বেশ সুখেই রয়েছেন। এ সময় এমন পরিবেশ ছেড়ে যেতে তাঁর ইচ্ছাও হচ্ছে না।

অথচ জুরিখের আমন্ত্রণ তিনি ফিরিয়ে দেবেন কিভাবে?

একদিন মিলেভাকে বললেন—জুরিখে অধ্যাপক হওয়ার জন্য আহ্বান এসেছে। কি করি বল ত?

মিলেভা খুশি হলেন। বললেন—ভালই হয়েছে। চল আমরা জুরিখে ফিরে যাই।

—বড় সমস্যায় পড়ে গেছি, মিলেভা। এখানে আমি বেশ শান্তিতে আছি। অনেক কাজ করবার সুযোগ রয়েছে। এ সময় জুরিখে ফিরে যাব? অ্যালবার্ট বিহ্বলকণ্ঠে বললেন।

মিলেভার চোখে-মুখে খুশির আলো। বললেন—এই আমন্ত্রণ আমার ভাল লাগছে। চল, আমরা জুরিখে ফিরে যাই। বাব্বা, এই পুরনো পচা শহরটা ছাড়তে পারলে বাঁচি।

—কিন্তু এখানে ত তুমি বেশ সুখেই আছ। সব কিছুই পেয়েছ। কোনও কিছুর অভাব নেই।

মিলেভা এবার সজোরে বলে উঠলেন—না, না। এখানে আমি একটুও সুখে নেই। জুরিখ ছাড়া আর কোথাও আমি সুখ পাই না, পাই না শান্তি।

আইনস্টাইন দুঃখিত হলেন। বললেন—দেখ, এখানে এই ত আমরা সবে একটু গুছিয়ে বসেছি। এখন চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মিলেভা সরোষে বললেন—জুরিখে আমি ফিরে যেতে চাই।

বিদায় প্রাগ!

সেটা উনিশ শ' বার সাল। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে আসছে।

এক সকালে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

সপরিবারে জুরিখে ফিরে এলেন আবার।

সাত

পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন সত্যের ইঙ্গিত করেছেন অ্যালবার্ট। পরমাণুর বিভাজন এবং বিভাজন জনিত শক্তির সম্ভাবনার কথা শোনালেন তিনি। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হলেন। পদার্থবিদরা খুশি হলেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কিন্তু শান্ত, বিজ্ঞান সাধনায় সমাহিত সাধক। স্থির মনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নতুন সাথী পেলেন অ্যালবার্ট।

মারসেল গ্রসম্যান···তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু।

—আমি জানি তুমি আসবে অ্যালবার্ট। জুরিখ শহরকে তুমি ভুলতে পার না।

—তা ঠিক। তবে আমার চেয়েও মিলেভা বেশি খুশি হয়েছে।

—কেন, তুমি ?

আইনস্টাইন চিরকালই সরল প্রকৃতির আপনভোলা সাধক। বললেন—প্রাগে বিজ্ঞান সাধনার বহু সুযোগ পেয়েছিলাম গ্রসম্যান। সে সব ছেড়ে চলে আসতে হল।

—এখানে আমরা আছি, তোমার অসুবিধে হবে না।

মারসেল গ্রসম্যান নিজে গণিতের অধ্যাপক।

অ্যালবার্ট আবার তাঁর সাধনা সুরু করলেন।

জুরিখ ছোট শহর। বিশ্ববিদ্যালয়টিও ছোট। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকরা বিজ্ঞান সাধনার জন্য অ্যালবার্টকে সব রকম সুযোগ করে দিলেন। একটি প্রতিভাধর মানুষের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতির গৌরব বর্ধিত হয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তেমনি প্রতিভা। তাই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ধরে রাখতে চায়।

আইনস্টাইন যেন সুইস জাতির চোখের মণি।

মারসেল গ্রসম্যান সব রকমে বন্ধুকে সাহায্য করতেন।

স্কুল জীবনে আইনস্টাইন অঙ্কশাস্ত্রে ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কলেজে পড়বার সময় তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে অঙ্কশাস্ত্রের দিকে আর নজর দেন নি অ্যালবার্ট। এখন গাণিতিক তত্ত্বগুলোর জন্য তাঁকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল।

গ্রসম্যান বললেন—তোমার গাণিতিক তত্ত্বের সমাধান আমি করে দেব, অ্যালবার্ট।

—ভালই হল। আইনস্টাইন খুশি হলেন।

আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে তিনি নতুন প্রবন্ধ রচনায় মন দিলেন।

জুরিখে কিন্তু বেশিদিন থাকা হল না অ্যালবার্টের।

মাত্র কয়েক মাস অধ্যাপনা করলেন জুরিখে।

তারপর বার্লিন থেকে অ্যালবার্টের কাছে আমন্ত্রণ এল। প্রুশিয়ান আকাডেমি অফ সায়ান্স অ্যালবার্টকে সভ্যপদে নিয়োগ করতে চায়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে হবে। গবেষণা করার বহু সুযোগ পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে অফুরন্ত অবসর। তাছাড়া ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক এবং অন্যান্য নামকরা বিজ্ঞানীদের সাথে থাকবার সুযোগ পাবেন।

অ্যালবার্ট একা বার্লিনে চলে গেলেন।

বিদায় জুরিখ! বিদায় মিলেভা!

কিন্তু ছেলে দু'টির জন্য অ্যালবার্টের মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

প্রুশিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী বার্লিন।

বিশাল শহর। এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে গোটা ইউরোপের কেন্দ্রস্থল।

বিজ্ঞান সাধক এবার পড়াশুনা আর গবেষণায় রত হলেন।

এখন উনি একা।

অধ্যাপক হিসাবে বহু অর্থও রোজগার করেন। কিন্তু তবু জুরিখের ছাত্রজীবনই তাঁর যেন আবার ফিরে এল।

এখন তাঁর চাই অবসর সময়। অফুরন্ত অবকাশ—পড়বার আর ভাববার।

বার্লিনে আসবার পর মায়ের চিঠি পেলেন অ্যালবার্ট।

—হারম্যান মারা গেছেন। দোকান ত আগেই বিক্রি করে দিতে হয়েছে। প্যাভিয়াতে আর থাকব কোথায়! তাই আমি জুরিখে মায়ার কাছে চলে যাচ্ছি। এখন যখন বার্লিনে রয়েছ তখন একদিন সময় করে

তোমার রুডি মেসোর সাথে দেখা করো। ওরা তোমাকে ভালবাসে। বার্লিনে ওরা তোমাকে দেখাশোনা করতে পারবে। ছেলেদের জন্যে তুমি দুঃখ কর না। ওরা ওদের মায়ের সাথে ভালই থাকবে। পলিন ছেলেকে চিঠি লিখেছেন।

বাবা মারা গেছেন!

একটা দারুণ আঘাত পেলেন অ্যালবার্ট। বার বার বাবার মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। জীবন ধারণের উপযুক্ত অর্থ আয় করার তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। ব্যবসা ফেল পড়েছে। যাযাবরের মতন এক শহর ছেড়ে আর এক শহরে গিয়েছেন। অ্যালবার্ট তাঁর একমাত্র ছেলে, কিন্তু সেই ছেলের শিক্ষার জন্য খরচ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

বাবা নেই, মা আজ কত অসহায়।

প্রফেসর উইণ্টলারের ছেলের সাথে মায়ার বিয়ে হয়েছে। মা এখন রয়েছেন মায়ার বাড়িতে।

ভালই হয়েছে মা প্যাভিয়া ছেড়ে চলে এসেছেন। অ্যালবার্ট একবার ভাবেন মাকে এবার বার্লিনে নিয়ে আসবেন। মা আর ছেলে একসঙ্গে থাকবেন। কিন্তু সাহস হয় না অ্যালবার্টের। জার্মানীর রাজনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। যে কোনও সময়ে যুদ্ধ লাগতে পারে।

তখন মাকে নিয়ে কোথায় যাবেন অ্যালবার্ট ?

রুডি মেসো বার্লিনে থাকেন। অ্যালবার্ট তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানেন।

মনে আছে ছোট্টবেলায় মিউনিখ থেকে মায়ের সঙ্গে বার্লিনে এসে তারা রুডি মেসোর এই বাড়িতে উঠতেন। সেসব দিনগুলো ছিল কত রঙিন, কত স্বপ্নভরা, মিউনিখ থেকে বার্লিন। তারপর দিন কয়েক বার্লিনে ছুটি কাটিয়ে আবার মিউনিখে ফিরে যাওয়া।

রুডি মেসোর বাড়িতে গানের আসর বসত।

মা বেহালা বাজাতেন আর না হয় পিয়ানোতে সুরের ঝঙ্কার তুলতেন।

আর ছোট্ট অ্যালবার্ট মায়ের পায়ের কাছে মেঝেয় বসে গান শুনত।

সব কথা মনে আছে অ্যালবার্টের। কিছুই তিনি ভোলেন নি।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

অ্যালবার্ট এক সকাল বেলায় রুডি মেসোর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। হাতে প্রিয় বেহালাখানা।

দরজার বেল বাজাতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে দরজা খুললেন।

আপনভোলা এক যুবককে বাড়ির দরজায় দেখে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কাকে চান ?

—আমি অ্যালবার্ট।

—কে অ্যালবার্ট ? আপনাকে ত চিনতে পারছি না।

—ওমা ! তুই এতবড় হয়েছিস। আয়, আয়। ভিতরে আয়। দরজার ওপাশ থেকে রুডি-মাসি এগিয়ে এলেন। তিনি ঠিক চিনতে পেরেছেন।

—কে ? আমি ত ঠিক চিনতে—।

রুডি মাসি হাত ধরে অ্যালবার্টকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

বললেন—তুমি চিনতে পারলে না। ও ত পলিনের ছেলে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

এবার ভদ্রলোক বেশ লজ্জায় পড়লেন। বললেন—সেই কবে ওকে দেখেছি বল। একদম ওকে আমি চিনতে পারি নি। তাছাড়া ও এখন কত বড় জান। বিশ্বের একজন সেরা বিজ্ঞানী। আমাদের গর্ব।

—এলসা। কোথায় গেলি ? দেখবি আয় কে এসেছে। রুডি-মাসি ডাকলেন।

ধীরে ধীরে এলসা ঘরে এলেন। বললেন একি অ্যালবার্টল। কেমন আছ ?

মুখ তুলে তাকালেন অ্যালবার্ট।

এলসা তাঁর সমবয়সী। ওর দু'টি বাচ্চা। ওরা ঠিক এলসার মতন দেখতে।

অ্যালবার্টল। অনেকদিন এই নামে কেউ তাকে ডাকে নি। ধীরে ধীরে বললেন অ্যলবার্ট—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ এলসা?

কোনও জবাব দিল না এলসা। মুখে বিষণ্ণ-হাসির ছোঁওয়া।

একদিন রুডি-মাসি বললেন—দু'বেলা তুই এখানে খাওয়া-দাওয়া কর অ্যালবার্ট।

—ঠিক বলেছ। আমরা এত কাছে রয়েছি। ও কেন কষ্ট করে একা পড়ে থাকবে। রুডি-মাসী দারুণ খুশি হয়ে বললেন।

এলসাও খুশি হয়ে সায় দিলেন—তোমার স্বাস্থ্যের জন্য এ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

আপনভোলা মানুষ অ্যালবার্ট। খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর থাকে না। মনে না করিয়ে দিলে ঠিক সময়ে খেতেও ভুলে যান।

অ্যালবার্ট এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন।

আইনস্টাইন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান কিংবা কোনও সভায় নিমন্ত্রিত তখন তাঁর কেতাদুরস্ত পোশাক গুছিয়ে দেন। অথচ এসব কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে কোনও দিনও দিন তাঁর ঝোঁক ছিল না। এলোমেলো টুইডের পোশাক আর ধূলোয় ধূসর বুট জুতো—ব্যাস। এই পরেই তিনি পণ্ডিতদের সভায় যান।

কিন্তু অভিজাত জার্মানরা আবার পোশাকের দিকে কড়া নজর রাখে।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বছর কাটল।

আপেক্ষিকতাবাদের ব্যাখ্যা করে আইনস্টাইন একখানা বই লিখলেন। বইখানা প্রকাশিতও হল। কিন্তু বইখানা নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল আলোচনা করার সুযোগ পেলেন না। ইউরোপের বুকে লড়াইয়ের দামামা বেজে উঠল।

এমন অবস্থায় কি করবেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন !

যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করেন। অ্যালবার্ট রাজনীতিক নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মনে দারুণ আঘাত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, যুদ্ধের দ্বারা দেশ ধ্বংস করা যায়। শান্তিপ্রিয় নরনারী হত্যা করা যায়। দেশর সম্পদ নষ্ট করা যায়—কিন্তু দেশ বা মানুষের কল্যাণ করা যায় না। তাই তিনি শান্তির পূজারী।

যারা যুদ্ধ বাধায় তাদের তিনি ঘৃণা করেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন যে, তিনি নিপীড়িতদের দলে।

অগ্নিগর্ভ ইউরোপের এই রূপ ফরাসী মনীষী এবং সহিত্যিক রম্যা রলাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি যুদ্ধ চান না, চান শান্তি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন আইনস্টাইন। হ্যাঁ, যুদ্ধ নয় শান্তি।

আইনস্টাইন লিখলেন : ভাবতে লজ্জিত হচ্ছি, পরের শতাব্দীর মানুষরা ভাববে গত তিন শ' বছর ধরে আমরা ধর্ম আন্দোলন করার পর কেবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। এই ধারণা যাতে আগামী দিনের মানুষরা করতে না পারে তাই অ্যালবার্ট শান্তির স্বপক্ষে দাঁড়ালেন।

স্বাধীনতা সব মানুষের জন্মগত অধিকার

পরাধীন দেশের মানুষ যখনই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করেছে আইনস্টাইন তখনই সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। পরাধীন, শোষিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর মনে ছিল দরদ। পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল। আইনস্টাইন সেই আন্দোলন সমর্থন করলেন। গান্ধীজীর কাছে চিঠি লিখলেন। ভবিষ্যতে অহিংস আন্দোলনই যে শান্তির সোপান রচনা করবে তা স্বীকার করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আর গবেষণা করতে যান কিন্তু মন তাঁর বিষণ্ণ।

যুদ্ধের অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগল।

জার্মানরা প্রচার করতে চাইছিল যে এ যুদ্ধের জন্য জার্মানী দায়ী নয়।

জার্মানরা ভেবেছিল যে, আইনস্টাইন তাদের পক্ষে যোগ দেবেন। তাদের অন্যায় যুদ্ধ সমর্থন করবেন এযুগের সেরা বিজ্ঞানী। তিনি মিউনিখে জন্মেছেন, কাজেই জার্মান জাতিকে সমর্থন করতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না।

কিন্তু আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন : যুদ্ধ অন্যায়, যুদ্ধ অমানবিক।

জার্মানরা খেপে গেল। তারা আইনস্টাইনকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। ওরা ঘোষণা করল : আইনস্টাইন ইহুদী, তিনি তাই জার্মান জাতকে ঘৃণা করেন। তিনি এখন স্যুইস নাগরিক, তিনি বিদেশী। তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না।

আইনস্টাইন কিন্তু নির্বিকার। নির্ভয়।

তিনি বিশ্ব-শান্তির পূজারী। তাই প্রাণের ভয়ে কিছুতেই যুদ্ধের স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারেন না।

এলসা ভীত হন। তাঁর ভাবনা, জার্মান-সম্রাট হয় ত আইনস্টাইনকে বন্দী করে রাখবেন।

—তুমি এসময় বার্নে ফিরে যাও, অ্যালবার্টল।

—এরা যেতে দেবে কেন?

—তুমি সুইস্ নাগরিক। সুইজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ দেশ। কাজেই জার্মান সরকার তোমাকে বার্লিন ছেড়ে যেতে বাধা দেবে না।

অ্যালবার্ট শান্ত ধীর কণ্ঠে বললেন—তা হয় না এলসা। তোমাকে এখানে ফেলে আমি চলে যেতে চাই না। বিপদের সামনে আমরা নির্ভয়ে দাঁড়াব।

নিজের কথা এবার খুলে বললেন এলসা—ওরা যদি তোমায় বন্দী করে?

—শান্তির জন্য নিপীড়ন সহ্য করব হাসিমুখে।

আর কিছু বললেন না এলসা।

দিন দিন যুদ্ধের অবস্থা আরও ঘোরাল হয়ে উঠল।

বিশ্বযুদ্ধ শেষে শান্তির আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা বিশ্বে।

আবার শুরু হল মানুষের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের গবেষণা। আনন্দের জন্য খেলাধূলা। কান্না থামিয়ে সবাই চায় খুশি মনে বাঁচতে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা অটুট রাখতে। যুদ্ধ স্বাভাবিক জীবনধারা ব্যাহত করে···কিন্তু সামাজিক শান্তি মানব-জাতিকে উন্নত করে।

উনিশ সালে পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণ হল।

আফ্রিকা আর ব্রেজিল থেকে এই পূর্ণগ্রাসের ছবি তোলার জন্য বিজ্ঞানীরা ওখানে হাজির হলেন। ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটিও কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে পাঠালেন। মাত্র ছ'মিনিটের জন্য পূর্ণগ্রাস হবে। আকাশে মেঘ না থাকলে সে সময় ছবি তোলার জন্য তাঁরা তৈরি হয়েই গেলেন।

আইনস্টাইনের মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে আবার আলোড়ন শুরু হয়েছে।

একদল বিজ্ঞানী বলছেন, আইনস্টাইন ঠিক বলেছেন। সময়, স্থান, বস্তু ও শক্তির সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেছেন তার মধ্যে কোনও ভুল নেই।

—কিন্তু প্রমাণ কই? কেবল সিদ্ধান্ত প্রচার করলেই ত হবে না। প্রমাণ দেখাতে হবে। কোনও বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রমাণ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। বললেন আর একদল বিজ্ঞানী।

এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ছবি যদি সফলভাবে তোলা যায় তবে আইনস্টাইনের মতবাদ প্রমাণিত হবে।

কিন্তু যে বিজ্ঞানীর মতবাদ নিয়ে এত আলোড়ন চলছে তিনি কিছুই জানেন না।

যুদ্ধ শেষ—শান্তি ফিরে এসেছে।

আইনস্টাইনের মন তাই শান্ত। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মাঝে আবার নিজেকে বন্দী করেছেন। বড় হয়েছেন কঠোর সাধনায়।

আফ্রিকায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হল। মেঘহীন অন্ধকার ঢাকা আকাশপট।

সেটা সে মাসের উনত্রিশ তারিখ।

ছবি তুললেন বিজ্ঞানীরা।

আইনস্টাইনের কাছে ছবি পাঠিয়ে দিলেন রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা।

এই ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছেন। আলোর গতি সম্পর্কে তাঁদের এতদিনকার সব ধ্যানধারণা বদলে গেল।

আলোর ধর্ম ব্যাখ্যা করে আইনস্টাইন তাঁর মতবাদে লিখেছিলেন—আলো ফোটন কণিকার সমষ্টি, তাই অন্য সমস্ত শক্তির মত আলো অভিকর্ষের নিয়ম মেনে চলে। আলো সরলরেখা পথে চলে না। আলোর সরণ-পথ হচ্ছে বাঁকা। বস্তুর রূপান্তরিত চেহারা আলো। তাই খুব প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর পথ নিশ্চয় বেঁকে যাবে।

কিন্তু কেবল মুখের কথায় বা কলমের লেখায় ত বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রমাণ চাই।

আইনস্টাইন লিখলেন—সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থিত কোন নক্ষত্রের ছবি তুলতে পারলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ছবি তুলে পাঠালেন।

এলসা ছবিগুলো স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন—এগুলো তোমার ধারণা সত্য প্রমাণ করবে।

একখানা গভীর কালো থালার মতন আকাশ-পটের ছবি। থালার চার ধারে আলোর ছটা। আর সূর্যের কাছাকাছি একটা নক্ষত্রের ছবিও উঠেছে। নক্ষত্রটির অবস্থান এই ছবিতে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে একটু সরে গেছে। সূর্যের পাশ ঘেঁষে যাওয়া এই নক্ষত্রটির আলোকরশ্মি সূর্যের দিকে একটু বেঁকে গেছে। অভিকর্ষের ফলে এই সরণ।

অনেকক্ষণ ধরে ছবিখানা দেখলেন আইনস্টাইন।

বললেন—সুন্দর! চমৎকার।

এলসা বললেন—এগুলো থেকে তোমার মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হবে, তাই না?

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কিসের প্রমাণ? কি বলছ বল ত?

—কেন? তোমার আপেক্ষিক মতবাদ সম্পর্কে কোন কোন বিজ্ঞানীর মনের ভুল ধারণা এবার দূর হবে।

প্রাণ-খোলা হাসি হেসে তিনি বললেন—প্রমাণ। আমার চাই না গো। আমি যা বলেছি তার মধ্যে কোন ভুল নেই।

খুশি মনে তিনি ছবিগুলো দেখতে লাগলেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন পথে ভাবনা শুরু হল।

খ্যাতির শিখরে উঠলেন আইনস্টাইন।

তাঁর নামে বহু শিশুর নাম রাখা হল, পুরস্কার দেওয়া হল তাঁর নামে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে হাজার হাজার চিঠি আসছিল।

কিন্তু আপনভোলা অ্যালবার্ট পরিপাটহীন পোশাক পরে সভায় সভায় বক্তৃতা দিতে যেতেন। এলসা টিকৃটিক্ করতেন। এত খ্যাতি অ্যালবার্টের, তিনি এমন ময়লা পরিপাটহীন পোশাকে কেন যাবেন সভায়?

প্রায়ই বলতেন এলসা—ফরসা জামা গায়ে দাও।

—কেন! এই ত বেশ ফরসা জামা পরেছি।

—ওটা নয়। এই জামা আর ট্রাউজারটা পর।

অ্যালবার্ট আর কথা বলেন না। এলসার কথা মতন পোশাক বদলে নেন।

অবার কোন কোন দিন অ্যালবার্টের টাইটা বেমানান মনে হয়।

এলসা বলেন—ইস্! টাইটা ঠিক মানাচ্ছে না। ওটা বদলে নাও।

অ্যালবার্ট হাসেন। জামা-কোট ট্রাউজার সবকিছুর সঙ্গে মানানসই টাই গলায় বাঁধতে হবে! এসব থেকে এতটুকু বিচ্যুত হলে চলবে না। বেমানান হলেই সবার চোখে পড়বে। আর জার্মানরা ত এসব ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে।

এলসা নিজেই টাইটা বদলে বেঁধে দেন।

কোন কোন দিন অ্যালবার্ট মোজা পরতে ভুলে যান। ভুল শুধরে দেন এলসা।

বলেন--তুমি ভুলে যাও কেন, তুমি একজন নামকরা বিজ্ঞানী। তোমার পোশাকে আচরণে নিন্দের কিছু থাকে না যেন।

আইনস্টাইন হেসে বলেন—যাঁরা আমার সভায় আসেন তাঁরা আমার কথা শুনতে আসেন, পোশাক দেখেন না। কি বললাম সেটাই তাঁদের কাছে বড়। সেটাই তাঁরা জানতে চান। আমার পোশাকে কিছু আসে যায় না।

এলসার তবু মন খুঁতখুঁত করে।

কিন্তু অ্যালবার্ট কিছুতেই বুঝতে চান না যে, তিনি একজন নামকরা মানুষ।

প্যারী অবজারভেটারি থেকে অ্যালবার্টকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান হল। নামকরা ফরাসী বিজ্ঞানীরা সে সভায় যোগ দেবেন। তাঁরা শুনবেন আইনস্টাইনের বক্তব্য।

টিকিট কেটে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা কামরায় চড়লেন আলবার্ট। মিশে গেলেন একেবারে সাধারণ স্তরের কুলি মজুরদের দলে। দরিদ্র এবং সাধারণ শ্রমজীবি বলে তিনি তাদের ঘৃণা করেন না। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার তাঁর মন কোনদিন ভারি করে নি।

স্টেশনে গাড়ি থামল। প্যারী শহর। জনবহুল। অজস্র গাড়ি ঘোড়া। ব্যস্ত, জন-চঞ্চল রাজপথ।

—অবজারভেটারি যাব, কোনদিকে বলতে পারেন? একজনের কাছে উনি জানতে চাইলেন।

পথ দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—ওখানে আজ আইনস্টাইন আসছেন।

—তাই ত এসেছি। কতদূর হবে?

ভদ্রলোক চলে যেতে যেতে বললেন—অনেক দূর! আপনি একখানা গাড়ি নিন।

আইনস্টাইন ধীরপদে অবজারভেটারির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

আর তখন সম্বর্ধনা-সভার কর্তা ব্যক্তিরা উচ্চ-শ্রেণীর কামরার দরজায় দরজায় ঘুরছেন। কোথায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন? তাঁর ত এ গাড়িতেই আসবার কথা। স্টেশনের বাইরে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

এমনি সরল ছিল তার জীবন।

পাঁচজনের চেয়ে বেশি বিশেষ কোন সম্মান তিনি আশা করতেন না। প্রতিভায় তিনি অসাধারণ হলেও সাধারণের মধ্যে তিনি তাদেরই এক-জন। তাই বিশেষ কোনও সম্মান তিনি চাইতেন না।

যুদ্ধ থেমেছে, শান্তিও ফিরে এসেছে দেশে।

কিন্তু জার্মানীর রাজনৈতিক অবস্থা আবার ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল। খ্রীস্ট-ধর্মী জার্মানদের ইহুদী বিরোধী মনোভাব দিন দিন বাড়ছিল। আইনস্টাইন ইহুদী। তাই তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কারো কারো মনে সন্দেহ দেখা দিল। কোন কোন জার্মান বিজ্ঞানী ত ঘোষণাই করলেন

যে, আপেক্ষিকতাবাদ হচ্ছে ইহুদী বিজ্ঞান। ওর মধ্যে কোনও সত্য নেই।

তাঁর সম্পর্কে কুৎসা রটলে তিনি নীরবে হেসে সব উড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞানী উপহাস করলে তাঁর মনে আঘাত লাগত।

মাঝে মাঝে বিজ্ঞানীদের সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য তিনি বিদেশে যেতেন। তখন মনের দুঃখ ভুলে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠতেন।

সেটা উনিশশ একুশ সালের কথা।

সকালবেলা। প্রাগ রেল স্টেশনে গাড়ি এসে থামল।

সারা শরীর ওভারকোটে জড়িয়ে টুপিতে মাথা ঢেকে এবং হাতে বেহালার বাক্স নিয়ে একজন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। স্টেশন থেকে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরলেন।

ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান ডাকল—আসুন সাহেব, আমার গাড়িতে চড়ুন। শহরের যেখানে যাবেন নিয়ে যাব। ভাড়াও সস্তা।

মাথা নেড়ে এগিয়ে চললেন তিনি।

এ তাঁর পরিচিত শহর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ তাঁর জানা।

কে এই আপনভোলা মানুষটি ?

রাজপথের কেউ তাঁকে চিনতে পারল না, তিনিই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছে।

অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হলেন। এই সেই প্রাগ বিশ্ব-বিদ্যালয়…এখানে একদিন অ্যালবার্ট অধ্যাপক ছিলেন। অনেক অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তাঁরা সবাই অ্যালবার্টকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

—অধ্যাপক আইনস্টাইন, আপনাকে আমাদের মধ্যে আবার পেয়ে আমরা খুশি হলাম।

খুশি হলেন অ্যালবার্ট নিজেও।

তাঁর সাদাসিধে এবং সরল ব্যবহারে সহকর্মীরা একটু অবাক হলেও তাঁদের মনে আনন্দ উপচে পড়ল। এত নামডাক অথচ তিনি ঠিক আগের মতনই রয়েছেন।

সে রাতে সভামণ্ডপ ভরে গেল।

সাদাসিধে মানুষ আইনস্টাইনকে দেখে দর্শকরা আনন্দে হাততালি দিলেন।

সম্বর্ধনা সভার শেষে আমন্ত্রিত এবং উপস্থিত বিজ্ঞানীদের কাছে আইনস্টাইন কোন বক্তৃতা দিলেন না। শুধু বেহালায় মোজার্টের সুর বাজালেন। খুশির সুর....আনন্দের পাখনা মেলে সেই সুর সভামণ্ডপে উড়তে লাগল।

আইনস্টাইন ত কেবল বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পীও।

নয়

আমেরিকা থেকে আইনস্টাইন কিন্তু সোজাসুজি জার্মানী ফিরলেন না।

লণ্ডনে নামলেন।

কিংস কলেজের পরিচালক মণ্ডলী বহুদিন আগে থেকেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিল। আইনস্টাইনের নিজেরও ইচ্ছে ছিল লণ্ডনে যাবেন এবং ইংরাজ বিজ্ঞানীদের সামনে ভাষণ দেবেন।

লণ্ডনে রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করলেন আইনস্টাইন।

অতিথি হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড হ্যালডেনের বাড়িতে।

পরের দিন জনসভা হল।

আইনস্টাইনকে সম্মান জানাবে লণ্ডনের সাধারণ মানুষ।

সভা-গৃহে তিলধারণের স্থান রইল না। ইংরাজ শিক্ষিত-সমাজ আইনস্টাইনকে দেখতে চায়। শুনতে চায় তাঁর ভাষণ। কর্মকর্তাদের মনে একটা ভয় ছিল, হয়ত সাধারণ ইংরেজরা আইনস্টাইনকে ভাল

মনে গ্রহণ করবে না। স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতবাদের বিরোধী আইনস্টাইনের মতবাদ। তার ওপর আইনস্টাইন জার্মান নাগরিক। মহাযুদ্ধের ক্ষত এখনও ইংরাজদের মন থেকে শুকোয় নি। স্বাভাবিক ভাবেই ইংরাজদের কাছে জার্মানরা ঘৃণ্য শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। লণ্ডনে তাই চাপা উত্তেজনার ভাব রয়েছে।

বিশাল জনতা দেখে লর্ড হ্যালডেনও চিন্তান্বিত হলেন।

কেবলমাত্র জার্মান নাগরিক বলেই কি এই বিশ্ব সেরা বিজ্ঞানীকে ঘৃণা করবে ইংরাজরা? আজকের সভায় উপস্থিত মানুষরা কি সম্মান জানাবে না আইনস্টাইনকে? সবাই কি আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীন মতবাদ বুঝতে এসেছে, না কি সভায় গোলমাল করতে এসেছে? স্যার আইজ্যাকনিউটনের জন্মভূমিতে আজ কি আইনস্টাইন অসম্মানিত হবেন?

আইনস্টাইন সভায় এলেন। বিশাল জন সমুদ্র নীরব।

চিন্তিত লর্ড হ্যালডেন আজকের অতিথির পরিচয় দিলেন।

এবার আইনস্টাইনের ভাষণ দেওয়ার পালা। উনি শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন। নীরব জনতা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। মন দিয়ে তারা আইনস্টাইনের ভাষণ শুনতে লাগল।

—সব সেরা বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্মস্থান এই ইংল্যাণ্ড। তাই এদেশ বিশ্বের বিজ্ঞানীদের তীর্থস্থান। বিজ্ঞান সব মানুষের মঙ্গলের জন্য। সব দেশে তার স্থান ছড়িয়ে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিউটন সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনা করেছেন। তাঁর আবিষ্কারের সুফল সমগ্র মানব জাতি ভোগ করছে। নিউটন তাই বিশ্ব মানবের কল্যাণকামী পুরুষ।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠল ইংরাজ শ্রোতারা।

আইনস্টাইন জার্মান নাগরিক হলেও একজন বিজ্ঞানী। মানব দরদী অসামান্য প্রতিভা।

তারপর ধীরে ধীরে আইনস্টাইন তাঁর নবীন মতবাদ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ইংরাজরা নীরবে তাঁর কথা শুনল।

আইনস্টাইন নিজেকে ভুলে গেলেন, ভুলে গেলেন তিনি একজন জার্মান। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন বিজ্ঞান সাধক।

ইংল্যাণ্ডের মানুষের হৃদয় জয় করলেন আইনস্টাইন। দুটি বিরোধী দেশের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হল।

বার্লিনে ফিরে আইনস্টাইন আবার বিজ্ঞান সাধনায় রত হলেন। সেই শান্ত সমাহিত সাধনা। ভেবেছিলেন শান্তি পাবেন।

কিন্তু সারা দেশে ইহুদী বিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ল।

শুরু হল ইহুদীদের উপর নির্যাতন। ইহুদী যুবকরা সরকারী চাকরি থেকে বিতাড়িত হতে লাগল। নতুন করে তারা কোনও চাকরি পেল না। জার্মান সমাজে ইহুদীরা যেন নিকৃষ্ট জীব। একমাত্র ঘৃণাই তাদের প্রাপ্য।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও ইহুদী। কিন্তু তাঁর বিশ্ব-খ্যাতি তাঁকে উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করল।

অ্যলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে মহাত্মা গান্ধীর নাম অজানা নয়।

বেতন হিসাবে সামান্য অর্থ পেতেন আইনস্টাইন। সাহায্য হিসাবেও কারো কাছ থেকে কিছু নিতেন না। কিন্তু এবার দুঃস্থ ইহুদীদের সাহায্য করার জন্য তিনি সভায় সভায় অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানাতে লাগলেন।

সাধারণ জার্মানরা তাদের প্রিয় আইনস্টাইনের ভিক্ষার ঝুলি ভরে দিল। নগরে নগরে চ্যারিটি শোয়ের ব্যবস্থা হল। সঙ্গীতের আসর বসবে···এবং সেই আসরে বেহালা বাজাবেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। হল ভরে গেল দর্শকে।

দুঃস্থ মানবাত্মার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন মানব দরদী বিজ্ঞানী। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ কি পিছিয়ে থাকতে পারে!

অভিজাত জার্মানরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার কয়েক মাস পরে জাপানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আইনস্টাইন আমন্ত্রিত হলেন।

এলসা খুশি হলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বার্লিনে আইনস্টাইন বিরোধী একটা চক্র গড়ে উঠেছে। দিন দিন সে চক্র প্রবল হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে একটা রাজনৈতিক আবর্ত। এ সময় যদি কিছুদিনের জন্যও আইনস্টাইন বার্লিন ছেড়ে বিদেশে চলে যান তবে তা' তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

এলসা বললেন—এর আগে তুমি ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে যাও নি?

—না। কোথায় গেলাম।

—যখন আমন্ত্রণ এসেছে ঘুরে এস।

আইনস্টাইন আনমনা হয়ে ভাবতে লাগলেন।

—বুঝেছি এলসা। তুমি চাও আমি এ সময় বার্লিন ছেড়ে কোথাও যাই, তাই না?

এলসা লজ্জিত হলেন। বললেন—তবে এ সময় তোমার বার্লিনে না থাকাই ভাল।

—প্রাচ্য ভূখণ্ড দেখবার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। ভাবছি যাওয়ার পথে মিশর দেখব। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর ভারতবর্ষেও একবার নামব।

এলসা খুশি হলেন। এ সময় যতদিন অ্যালবার্ট দেশের বাইরে থাকবেন ততই মঙ্গল।

উনিশ শ' বাইশ সাল।

ফ্রান্সের মার্সেইলস্ বন্দর থেকে আইনস্টাইন জাহাজে প্রাচ্যের পথে যাত্রা করলেন। জাপানী জাহাজ ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নোঙর করল। আইনস্টাইন মিশর দেখলেন।

বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থামল। কিন্তু ভারতের বুকে আইনস্টাইনের নামা হল না। শহরে তখন প্লেগ দেখা দিয়েছে। লোক মারা যাচ্ছে। আইনস্টাইনকে নিয়ে জাপানী জাহাজ চলে গেল। না, আর কখনও

আইনস্টাইন ভারতে আসেন নি তবে মহাত্মা গান্ধী আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। চিঠি লিখতেন প্রায়ই তাঁদের কাছে।

চীনের সাংহাই বন্দরে জাপানী জাহাজ থামল।

বন্দরে চীনারা সম্বর্ধনা জানাল মহান বিজ্ঞানীকে।

তারপর জাপানে পৌঁছলেন আইনস্টাইন।

এশিয়ার মধ্যে বিজ্ঞানে এবং সম্পদে সবচেয়ে উন্নত দেশ জাপান।

রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল জাপানীরা। আইনস্টাইন যেদিন জাপানে নামলেন সেদিন ওখানে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত হল। সম্রাট তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে বন্দরে উপস্থিত হলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে।

জাপ সম্রাজ্ঞী মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে স্বাগত জানালেন। টোকিও সিটি হলে সভা হল। হাজার হাজার জাপানী নরনারী হাজির সভায়।

আপনভোলা বিজ্ঞানী। সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তিনি জাপানী ভাষা জানেন না। আর জাপানী নরনারীরাও তাঁর ভাষা বোঝে না। কিন্তু তবু সভা নীরব। শ্রোতারা সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর কথা শুনছে।

আইনস্টাইন বলছেন তাঁর মতবাদের কথা।

মাঝে মাঝে থামছেন। দোভাষী তাঁর ভাষণ জাপ-ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

জাপানের অনেকগুলো শহরে আইনস্টাইন বক্তৃতা দিলেন।

একবার জাপানের একটা ছোট কারখানা শহর ঘুরে দেখতে চাইলেন আইনস্টাইন।

রাজসরকার খুশি হলেন। ঠিক হল পরের দিন অতিথিকে শহর দেখানো হবে।

ছোট্ট শহর। ছিমছাম সব বাড়ি ঘরদোর। ছোট ছোট কাঠের

বাড়ি। কাঠের নোয়ানো ছাদ। ঘরের দেওয়ালে রঙিন ফুলআঁকা ওয়াল-পেপারের আবরণ। বাড়ির বাগানে ফুলভরা চেরী গাছ।

কারখানা শহর। বেশির ভাগ কারখানার মজুরদের বাসস্থান।

রাস্তাগুলো তত চওড়া নয়। মোটর যেতে পারে না।

পরের দিন সকাল বেলা সুসজ্জিত রিকশা নিয়ে আসা হল। একজন সবল শ্রমিক রিকশা টানবে। আইনস্টাইন সেই রিকশা চড়ে শহর দেখবেন।

মানুষে টানা রিকশা দেখে অবাক হলেন বিজ্ঞানী। দুঃখও পেলেন।

—কি হবে এই মানুষে টানা গাড়ি! জানতে চাইলেন অ্যালবার্ট।

—গাড়িতে চড়ুন, স্যার। শহর দেখবেন।

আপত্তি জানালেন আইনস্টাইন।

—মানুষে টানা গাড়িতে চড়ে আমি আরাম করতে চাই না। চাই না কোনও মানুষ আমাকে জানোয়ারের মতন বহন করুক। আমি পায়ে হেঁটে শহর দেখব।

সেদিন ঘুরে ঘুরে হেঁটে হেঁটে শহর দেখলেন। তারপর থেকে যখনই সুবিধা হত আইনস্টাইন পায়ে হেঁটে ঘুরতেন। সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলতেন। তাদের আচার-ব্যবহার দেখতেন। জাপানীদের ব্যবহার আর তাদের সুন্দর ছিমছাম বাড়িঘরদোর দেখে আইনস্টাইন খুশি হয়েছিলেন।

জাপান থেকে ফেরার পথে আইনস্টাইন প্যালেস্টাইনে নামলেন। অতিথি হলেন বৃটিশ হাই কমিশনারের।

কেতাদুরস্ত আর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ। থাকা খাওয়ার রাজসিক ব্যবস্থা। মুখের কথা খসাবার আগেই পরিচারকরা ছুটে আসে হুকুম তালিম করতে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সামনে ঢেলে দেয়।

অ্যালবার্ট আর এলসা অস্বস্তি অনুভব করেন।

যখনই হাই কমিশনার হাউস ছেড়ে বাইরে যেতেন তখনই কামান গর্জন করে উঠত। বাসভবনের অঙ্গনে সৈন্যবাহিনী মার্চ করত। আইনস্টাইন অতিথি···তাই রাজকীয় সম্মান দেখান হচ্ছে তাঁকে।

কিন্তু তাঁরা এমন ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত নন।

মাঝে মাঝে এলসা অধীর হয়ে পড়তেন।

—দেখ, এসব রাজসিক ব্যাপার আমার ভাল লাগছে না। চল আমরা চলে যাই।

এলসাকে সান্ত্বনা দিতেন অ্যালবার্ট—সব কিছু তোমার মনের মতন হয় না, এলসা। তাই মানিয়ে নিয়ে বাস করতে হয়। আমরা এখানে অতিথি। কাজেই এখানকার ব্যবস্থা আমাদের মেনে নিতেই হবে।

আইনস্টাইন তখন জাপানে।

খবর বেরল, স্যুইডিস এ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স তাঁকে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। একজন বিজ্ঞান সাধকের পক্ষে এই পুরস্কার লাভ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

সারা জার্মানী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

যুদ্ধের পর এই প্রথম একজন জার্মান নাগরিক নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

বার্লিনে ফিরে এলেন আইনস্টাইন পরিবার। আইনস্টাইন যে একজন ইহুদী তা জার্মানরা ভুলে গেল। আবার বার্লিনের খবরের কাগজগুলো অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ছবি ছাপল। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করল। লিখল, আইনস্টাইন জার্মানীর গর্ব।

কয়েক সপ্তাহ বার্লিনে থাকার পর আইনস্টাইন সুইডেনে চলে গেলেন।

সুইডেনের রাজার হাত থেকে নোবেল পুরস্কার নিতে হয়। রাজধানী স্টকহোমে পুরস্কার বিতরণী সভা হল।

নোবেল পুরস্কারের মূল্যমান হিসাবে অ্যালবার্ট চল্লিশ হাজার ডলার পেলেন। তবে অর্থের প্রতি কোনদিন তাঁর মোহ ছিল না। তিনি

নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তাঁর দুই ছেলের সুশিক্ষার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর প্রথমা স্ত্রী মিলেভার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সুইডেন থেকে ফিরে আইনস্টাইন আবার বিজ্ঞান সাধনায় রত হলেন।

এল উনিশ শ' উনত্রিশ সাল।

অ্যালবার্ট তাঁর নবীন মতবাদ নিয়ে আবার কয়েকটা প্রবন্ধ লিখলেন।

রিলেটিভিটি মতবাদ থেকেই সৃষ্টি হল ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী অর্থাৎ একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণে সব দিকে সব জায়গায় একই শক্তি নানা অবস্থায় বিরাজ করছে। মহাকর্ষের ভৌত নিয়মগুলোর সঙ্গে তড়িৎ চুম্বকের তত্ত্বকে তিনি একত্রিত করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই মহাবিশ্বে একাধিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে তা ভুল। মহাকর্ষ ও তড়িৎ চুম্বক আলাদা এবং সংযোগহীন নয়। একটি শক্তি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে একই নীতির মাধ্যমে।

আবার আলোড়ন সৃষ্টি হল বিশ্ব বিজ্ঞানী মহলে। সাংবাদিকরা তাঁর কাছে হাজির হলেন। —আপনার একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন।

আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের তুলনায় একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব আরও জটিল।

দশ

উনিশ শ' বত্রিশ সাল।

আইনস্টাইন বার্লিনে বিজ্ঞান সাধনায় রত আপনভোলা অধ্যাপক।

আইনস্টাইন তৃতীয়বারের জন্য আমেরিকা দর্শনের আমন্ত্রণ পেলেন। এবারেও তাঁকে কালিফোর্নিয়া যেতে হবে।

আইনস্টাইন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করে জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন।

আমেরিকা দর্শনের জন্য নয় এসময় বার্লিন ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে এলসা খুশি। ঝড় উঠবার আগে যেমন চারধারে থমথমে ভাব থাকে গোটা জার্মানীর অবস্থা তেমনি।

হিটলারের নাজী দল দিন দিন শক্তি আহরণ করছে। নাজী দল ইহুদীদের ঘোর শত্রু। তারা আইনস্টাইনকেও ছাড়ছে না।

সাম্যবাদী দলের শক্তি খুবই নগণ্য। একমাত্র তারাই বিপ্লবের কথা বলছে। জাতি ধর্মের কোনও ভেদাভেদ তারা করে না। তারা চায় শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করুক। গড়ে তুলুক নতুন জার্মানী। মাঝে মাঝে বার্লিনের রাজপথে সাম্যবাদীদের সাথে নাজী দলের সংঘর্ষ বাধছে।

যাত্রার আগের দিন সকালে আমেরিকার কনসাল অফিস আইনস্টাইনকে ডেকে পাঠাল। বৃষ্টি পড়ছিল। তবু আইনস্টাইন কনসাল অফিসে গেলেন।

একজন কেরানী বলল – বসুন, মিস্টার আইনস্টাইন।

উনি বসলেন।

—আচ্ছা, এ সময় আপনি যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চান কেন?

—আপনার দেশের সরকারের আমন্ত্রণে যাচ্ছি। ওখানকার কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করারও ইচ্ছে আছে।

— আপনার রাজনৈতিক মতবাদ কি?

আইনস্টাইন জবাব দিলেন আমি রাজনীতিক নই। তাই রাজনীতির সাথে আমার কোনও যোগ নেই।

কনসাল অফিসের কেরানীর এসব প্রশ্ন শুনে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন দারুণ অবাক হলেন। এসব প্রশ্ন কেন? কি জানতে চায় এরা? এ ধরনের প্রশ্ন ত এর আগে কখনও জিজ্ঞাসা করেনি? মনে মনে বিরক্ত হলেন।

বললেন—বেশ ত। আমাকে ভিসা দিতে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে ত আমি যুক্তরাষ্ট্রে যাব না।

আইনস্টাইন কনসাল অফিস থেকে চলে এলেন। এবার তটস্থ হয়ে উঠল কনসাল অফিস। এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে তা তারা ভাবে নি।

সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনকে ছাড়পত্র দেওয়া হল। এবং ছাড়পত্র নিয়ে একজন বিশেষ প্রেরক গেল আইনস্টাইনের বাসায়।

খবরের কাগজগুলো কনসাল অফিসের সব ঘটনা ছাপাল। বার্লিনের নামকরা দৈনিকে কড়া মন্তব্য প্রকাশিত হল। মার্কিন সরকার অসম্মান করেছেন মহা-বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে। খবর চলে গেল নিউইয়র্কে। মাননীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিকে অসম্মান করার অধিক ার কে দিল কনসাল অফিসের কেরানীকে।

—শোন এলসা। একদিন বললেন আইনস্টাইন।

এলসা বললেন—কি ?

—ওরা ভেবেছে, আমি ওদের দেশে গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি। ওদের যখন এই বিশ্বাস তখন আমি ওদের দেশে যাব না।

এলসা ওঁকে বোঝালেন—দেখ, তোমার হয়ত বোঝার ভুল হচ্ছে !

—কেন ?

—কেরানীর ভুলে এমন ঘটনা ঘটেছে। খবরের কাগজগুলো যেভাবে সোরগোল তুলেছে তাতে বেচারার হয়ত চাকরি যাবে। তুমি শান্ত হও, অ্যালবার্ট !

নীরবে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন আইনস্টাইন।

এক সময় এলসার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠিক বলেছ। আমার রাগের জন্য একজন কেরানী চাকরি খোয়াবে এটা ঠিক হবে না। তুমি ওদের ফোন করে জানিয়ে দাও আমি কালই যাত্রা করব।

আপনভোলা বিজ্ঞানীর রাগ জল হয়ে গেল।

পরের দিন বার্লিনের বাসা ছেড়ে আইনস্টাইন বিদেশ যাত্রা করলেন।

এটি তাঁর বহুদিনের আশ্রয়স্থল। ঘর ভরা অজস্র বই পড়ে রইল। থাকল টেবিলের উপর তাঁর বহুদিনের সঙ্গী পাইপটা। আইনস্টাইন চলে গেলেন।

বার্লিনের এই বাসায় আর কোনও দিন ফিরে আসেন নি আইনস্টাইন।

উনিশ শ' তেত্রিশ সাল।

মার্চ মাস।

রাইখস্ট্যাগে আগুন জ্বলে উঠল—রাজনৈতিক আগুন।

এডলফ হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করল।

আইনস্টাইন তখন কালিফোর্নিয়াতে ছিলেন। জার্মানীর সব খবর তাঁর কাছে ঠিক মতন পৌঁছয় নি। উনি তাই ঠিক করলেন যে, বার্লিনে ফিরে যাবেন।

কালিফোর্নিয়া থেকে নিউইয়র্ক ছুটছে ট্রেন। জানালার বাইরে নিউজার্সির জলাভূমি পিছিয়ে যাচ্ছে প্রতি ক্ষণে। আর নজরে পড়ছে দূরে বহু দূরে নিউইয়র্কের আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলো।

সহসা এলসার সাথে জার্মান কনসাল কামরায় এসে ঢুকলেন।

আইনস্টাইনের সাথে কনসালের আগেই পরিচয় ছিল।

—আসুন ডক্টর শ'ওয়ারজ! জার্মানীর আসল অবস্থা একটু খুলে বলুন ত! আমার পক্ষে এখন জার্মানীতে ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক হবে, তাই না? বললেন অ্যালবার্ট।

কনসাল দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—জার্মানীতে ফিরে যেতে বলার জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি, অধ্যাপক আইনস্টাইন। সঠিক চললে কারও কোন ভয় নেই। ফিরে চলুন।

কি যেন ভাবলেন আইনস্টাইন।

তারপর বললেন—জার্মান সরকারের কার্যকলাপ আমাকে দারুণ আঘাত করছে, ডক্টর শ'ওয়ারজ। আমি আর বার্লিনে ফিরব না।

—এটাই কি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত? আর একবার ভেবে দেখুন।

মাথা নাড়লেন আইনস্টাইন। দৃঢ়স্বরে বললেন—এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

ডক্টর শ'ওয়ারজ খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন।

ট্রেন অবিরাম ছুটে চলেছে। শহর নিউইয়র্ক এগিয়ে আসছে কাছে…আরও কাছে।

কনসাল বললেন সরকারী কর্তব্য করেছি। এবার বন্ধু হিসাবে বলছি, বার্লিনে না ফিরে আপনি ভাল কাজ করেছেন। ফিরলে আপনি বিপদে পড়বেন।

আইনস্টাইনের শেষ সিদ্ধান্তে নিউইয়র্কের জনসাধারণ উল্লসিত হল।

কিন্তু আইনস্টাইন নিউইয়র্কে থাকতে পারলেন না।

প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের কাছে তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

সারা জার্মানীতে সোরগোল পড়ে গেল।

হিটলার এবং তার গেস্টাপো বাহিনী ভাবতেও পারে নি যে, ইহুদী আইনস্টাইন তাদের হাতের নাগাল ছেড়ে যাবেন!

সাধারণ জার্মানরা জিজ্ঞাসার ঝড় তুলল…আইনস্টাইন জার্মানীর গর্ব, তিনি কেন দেশ ছাড়লেন? তবে কি নাজী সরকার তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছেন?

জার্মানীর কয়েকখানা সংবাদপত্র লিখল…আইনস্টাইন বিশ্বাসঘাতক! জ্বলজ্যান্ত সব মিথ্যা কাহিনী তাঁর নামে লেখা হতে লাগল দিনের পর দিন।

একখানা খবরের কাগজ তাঁর ছবি ছাপিয়ে নীচে লিখল এখনও একে ফাঁসি কাঠে ঝোলান যায় নি।

নাজী কারাগারে বন্দী ইহুদী মনীষীরা হাঁফ ছাড়লেন।

যাক। অন্তত আইনস্টাইন অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন।

এলসা ভয় পেলেন। হয়ত গুপ্তঘাতকরা আইনস্টাইনকে খুন করার চেষ্টা করবে। খবর এসেছে নাজী গুণ্ডা-বাহিনী বার্লিনে আইনস্টাইনের বাসায় ঢুকে তাঁর সব বইপত্তর পুড়িয়ে দিয়েছে। পুড়িয়ে দিয়েছে তাঁর পাণ্ডুলিপি।

আইনস্টাইনের কয়েকজন বন্ধুকে নাজীরা হত্যা করেছে। এবার তাঁর পালা।

আইনস্টাইন কিন্তু এসব খবরের কোনও গুরুত্ব দিলেন না।

বেলজিয়ামের রাজা রানী আইনস্টাইনের বন্ধু।

তাঁরা তাঁকে নিজেদের রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানালেন। দেশ ও কালের সীমিত গণ্ডী টেনে আইনস্টাইনের মতন বিরল প্রতিভাকে বন্দী করে রাখা যায় না। তিনি সব দেশের সব কালের এক উজ্জ্বল সম্পদ।

আইনস্টাইন বেলজিয়ামে চলে এলেন।

রাজা রানী খুব খুশি হলেন। খুশি হল বেলজিয়ামের লোকেরা।

সমুদ্রের তীরে একখানা সুন্দর সাজানো বাঙলোতে আইনস্টাইন পরিবারকে থাকতে দেওয়া হল। আইনস্টাইন আবার গবেষণা শুরু করলেন।

একবার রাজার পল্লীভবনে গানের আসর বসল।

আইনস্টাইনও সেখানে নিমন্ত্রিত। তিনি প্রিয় বেহালাখানা হাতে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা কামরায় চড়লেন। তারপর গ্রামের স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে জলসায় হাজির হলেন।

ওদিকে রাজদরবারের কর্মচারীরা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির।

তাঁরা খুঁজছেন প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলোতে।

কিন্তু কোথায় আইনস্টাইন? তাঁকে ত পাওয়া গেল না।

জলসায় নাইনথ সিম্ফনি বাজালেন আইনস্টাইন। মুগ্ধ হয়ে গেল

শ্রোতারা। এ আর এক মানুষ। তিনি যেন রিলেটিভিটির আবিষ্কারক নন...নন একজন মহান বিজ্ঞানী। জলসার শ্রোতারা পরিচয় পেলেন একজন মহান শিল্পীর।

রাজা রানী কিন্তু চিন্তিত হলেন আইনস্টাইনের জন্য।

জার্মানীর এত কাছে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় আইনস্টাইনের থাকা উচিত নয়। চারধারে হিটলারের গুপ্তচররা রয়েছে। যে কোন সময়ে তারা মহান বিজ্ঞানীকে নিহত করতে পারে। তাদের চোখে আইনস্টাইন বিশ্বের সম্পদ নয়···বিশ্বাসঘাতক।

এখন থেকে তাই আইনস্টাইনকে রক্ষা করার জন্য কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হল। পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে তাঁর সাথে দেখা করা খুবই কঠিন।

একবার প্রাগ থেকে ডক্টর ফিলিপ ফ্রাঙ্ক এসেছিলেন আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে। এক সময় তিনি তাঁর সহকর্মী ছিলেন। পাহারাদাররা তাঁকে বাধা দিল।

—মিস্টার আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করব। বললেন ডক্টর ফ্রাঙ্ক।

—কোথা থেকে আসছেন? কি নাম আপনার?

ডক্টর ফ্রাঙ্ক নিজের নেম কার্ড এগিয়ে ধরলেন!

সব শুনে আইনস্টাইন দারুণ লজ্জিত হলেন। নিজেই এসে ডক্টর ফ্রাঙ্ককে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

দুই বিজ্ঞানীর মন-খোলা হাসিতে পরিবেশ সহজ হল।

অবস্থা কিন্তু দিন দিন ঘোরালো হতে লাগল। এটা বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, জার্মানীর নিকটের কোন দেশে আইস্টাইনের থাকা নিরাপদ নয়। নাজী গুপ্তঘাতকরা সুযোগ খুঁজছে...তারা আইনস্টাইনকে আঘাত হানবে।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

অধ্যাপক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল প্যারীর সরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়।

এলসা বললেন—না, প্যারীতে থাকা ঠিক হবে না।

স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ করল।

কিন্তু আইনস্টাইন মাদ্রিদে যেতে চাইলেন।

জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানাল।

এর আগেই জেরুজালেমে বৃটিশ হাই কমিশনে অতিথি হয়েছিলেন আইনস্টাইন। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ। ওখানে আর তিনি যেতে চাইলেন না। এলসা নিজেও রাজী নন।

—তবে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চল। বললেন এলসা।

আইনস্টাইন ধীরে ধীরে বললেন—হ্যাঁ, তাই ভাবছি।

—তোমার পক্ষে আমেরিকা নিরাপদ, অ্যালবার্ট্ল। তাছাড়া··· বলতে বলতে থামলেন এলসা।

—তাছাড়া কি ? বলতে বলতে থামলে কেন ?

এলসা বললেন—আমাদের আত্মীয় আর বন্ধুরা আগেই বার্লিন ছেড়ে আমেরিকায় চলে গেছেন। তারাও আমাদের ওখানে যেতে লিখেছেন। চল, ওখানেই আমরা যাই।

জার্মানীতে ইহুদী দলন শুরু হতেই অনেক ইহুদী পরিবার আমেরিকায় চলে গেছেন। সেখানে তাঁরা ব্যবসা গড়ে তুলেছেন।

আইনস্টাইন ঠিক করলেন, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হবেন।

এগার

বেলজিয়ামের রাজা রানী দুঃখিত মনে তাঁদের বন্ধু আইনস্টাইনকে বিদায় জানালেন।

অ্যালবার্ট আর এলসা আমেরিকায় চলে গেলেন। নিরাপত্তার জন্য তাঁদের আগমনের খবর গোপন রাখা হয়েছিল। এমন কি খবরের কাগজের সংবাদদাতারা তাঁদের আসবার খবর পান নি।

আমেরিকান সরকার তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আইনস্টাইন পরিবার সোজা নিউইয়র্ক থেকে প্রিন্সটন শহরে চলে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শহর। নাসাউ স্ট্রীটের একখানা বাঙলোতে উঠলেন। সুন্দর সাজানো-গোছানো একখানা বাড়ি। নির্জন।

অ্যালবার্ট আবার বিজ্ঞান সাধনায় ডুবে গেলেন।

রাজনীতি, জার্মানীর পট-পরিবর্তন কোন দিকেই তিনি আর মন দিলেন না।

একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্পর্কে নতুন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখলেন।

এল উনিশ শ' ছত্রিশ সাল।

নাসাউ স্ট্রীটের বাড়িতে এলসা মারা গেলেন। আইনস্টাইন এখন একা।

প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কর্মস্থলে হাজির হন। সেই আপনভোলা ভাব। একমাথা অগোছাল চুল। পারিপাট্যহীন পোশাক। মুখে সধূম পাইপ। হাঁটছেন আর চিন্তা করছেন। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজোময় পদার্থ। শত শত বৎসর ধরে তাদের মধ্যে ভাঙন চলেছে এবং সম্ভব হচ্ছে অতি দীর্ঘ সময় ধরে তেজস্ক্রিয়তার বিচ্ছুরণ। কখনও ভাবেন নিজের বিখ্যাত সমীকরণটির কথা। $E_, mc^2$; কি অর্থ এই সমীকরণের? $E =$ মোট শক্তি। $m =$ ভর। আর $c =$ আলোর গতিবেগ (নির্দিষ্ট)। এই নিরিখে যদি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থকে সম্পূর্ণ বিভাজন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় তবে তা থেকে সৃষ্টি হবে শক্তি···মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আলোর সমান গতিবেগ···হয়ত তারও বেশি গতিবেগ।

ইনস্টিটিউট্ অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি।

বিজ্ঞান শেখবার এবং শেখাবার স্থান। ছাত্ররা সবাই উঠতি বিজ্ঞানী।

অল্প আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একখানা ঘর।

এখানাই আইনস্টাইনের ঘর।

—আপনার ঘরে আর কি দেব স্যার? জানতে চেয়েছিলেন

পরিচালক-মণ্ডলী।

ঘরখানা দেখে বলেছিলেন আইনস্টাইন—এই ত একখানা ব্ল্যাকবোর্ড আর খড়ি রয়েছে। রয়েছে বসে পড়বার ডেস্ক। চেয়ারও রয়েছে কয়েকখানা। ব্যস! কিছু কাগজ, পেন্সিল আর বড় একটা ঝুড়ি দেবেন।

—বড় ঝুড়ি··· ?

—হাঁ, আমি যে বড্ড ভুল করি।

আপনভোলা মানুষ···বড্ড ভুল করেন।

একবার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রিন্সটন শহরে পথ হারিয়ে ফেললেন। হেঁটেই চলেছেন কিন্তু নাসাউ স্ট্রীটে নিজের বাড়িতে পৌঁছতে পারছেন না। আর নাসাউ স্ট্রীটই বা কই। রাস্তা ত সবই একরকম বাড়িগুলোও একই ধাঁচের।

এক সময় বুঝতে পারলেন যে তিনি পথ হারিয়েছেন।

এ যেন গোটা শহরটাই একটা গোলকধাঁধা।

এক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলেন আইনস্টাইন—নাসাউ স্ট্রীট কোন দিকে।

—এখান থেকে সোজা পূব দিকে গিয়ে ডান দিকে মিনিট দশেক হাঁটবার পর বাম দিকে একটা রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে কিছুটা হাঁটার পর উত্তরদিকে পড়বে নাসাউ স্ট্রীট। পুলিশটি গম্ভীরভাবে বলল।

—কিন্তু···!

সোজা রাস্তায় চলে যান। আরে ওখানেই ত স্যার আইনস্টাইন থাকেন। মস্ত বড় বিজ্ঞানী, আপনি কত নম্বর বাড়ি খুঁজছেন ?

বাড়ির নম্বর ? একদম ভুলে গেছেন আইনস্টাইন। সতের না বাইত্রিশ ? না না। বোধ হয় ছাব্বিশ ! মনে সন্দেহ দেখা দেয়। চুপ করে থাকেন।

—আচ্ছা, চলুন। আমিও ওদিকে যাব।

পুলিশটি তাঁকে সঙ্গে করে নাসাউ স্ট্রীটে আনল।

এবার নিজের বাড়ি চিনতে পারলেন। নিজের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—এই বাড়ি। ধন্যবাদ।

—এই বাড়ি? এখানে ত স্যার আইনস্টাইন থাকেন।

এবার লজ্জিতভাবে তিনি বললেন—আমি আইনস্টাইন।

এত বড় নামকরা বিজ্ঞানী। বাড়ির নম্বর ভুলে যান! পুলিশটি অবাক হয়ে গেল।

আমেরিকায় তাঁর জীবন শান্তিতে কাটতে লাগল।

উনিশ শ' উনচল্লিশ সাল। সেপ্টেম্বর মাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল ইউরোপের বুকে।

সারা ইউরোপ জয় করার উন্মত্ত ইচ্ছা নিয়ে হিটলার পোল্যাণ্ড দখল করল। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব কটা বলকান রাজ্য এবং ফরাসী দেশ তার কবলে গেল। ইংরেজদের ভরাডুবি হতে লাগল বার বার লড়াইয়ে। অজেয় হিটলার, অজেয় তার নাৎসী-বাহিনী।

লড়াই শুরু হওয়ার প্রায় প্রথমদিকে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। আইনস্টাইনের চিন্তা-ভাবনা এই জার্মান বিজ্ঞানীকে পথ দেখাল। পরমাণু বিভাজনের পদ্ধতি আবিষ্কার করার ফলে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী হল জার্মানী। এবার পরমাণু বোমার পালা।

দু'জন নামকরা বিজ্ঞানী ফেরমী আর শিলার্ড এলেন আইনস্টাইনের কাছে। তাঁরাও জার্মান। দেশছাড়া। তাঁরা অটো হানের পরমাণু বিভাজনের কথা বললেন।

আইনস্টাইন নিজে উনিশ শ' পাঁচ সালে লেখা একটা প্রবন্ধে পরমাণু বিভাজনের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। আজ তা' সত্যে পরিণত হল। কিন্তু এই অপরিমেয় শক্তি যদি ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয় তবে ত মানব-জাতির সমূহ ক্ষতি হবে।

জার্মানরা যদি এই শক্তির সাহায্যে তৈরি করে পরমাণু বোমা?

বিজ্ঞানী ত্ব'জন বললেন—জার্মানরা পরমাণুর শক্তি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু ওদের বিজ্ঞানীর অভাব।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি? জানতে চাইলেন আইনস্টাইন।

—আমেরিকা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। স্থলে-জলে আকাশে যুদ্ধ চলছে। আমেরিকায় বিজ্ঞানীর অভাব নেই। তারা পরমাণু নিয়ে গবেষণা করলে অমিত শক্তি আয়ত্ত করতে পারবে। এবং জার্মানীকে তখন পরাজিত করা সম্ভব হবে।

আইনস্টাইন নীরবে শুনলেন।

—আপনি যদি এ সম্বন্ধে চিঠি লেখেন তাহলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আপনার কথা শুনবেন।

বিজ্ঞানীদের অনুরোধে প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লিখলেন আইনস্টাইন: ফারমী আর শিলার্ডের গবেষণার পাণ্ডুলিপি পড়ে আমার ধারণা হচ্ছে যে, ইউরেনিয়ামের অণুর বিভাজনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সৃষ্টি হবে। এবং এই ধরনের একটিমাত্র বোমা বর্ষণে একটি বন্দর এবং তার আশপাশের সব স্থান একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকায় পারমাণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করলেন। বলা যায় যে, সেদিন থেকেই শুরু হল পারমাণবিক যুগ।

পরিচালনার কাজে আইনস্টাইন সরাসরি বিজড়িত না থাকলেও পারমাণবিক গবেষণার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের ছ'ই আগস্ট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্ক।

সেদিন পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হল। বর্ষিত হল জাপানের হিরোশিমা শহরে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সারা শহর কেঁপে উঠল, শহরের আকাশের উড়ল ছত্রাকের মতন বেগুনি ধোঁয়া। প্রদীপ্ত আলোয় চোখ ঝলসে গেল। সমগ্র শহর আর বন্দর কেঁপে উঠল।

ভেঙে পড়তে লাগল বাড়ি ঘরদোর। খেলনার মতন মোটর গাড়ি-গুলো পড়ল ছিটকে। আগুনের উত্তাপে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী আর গাছগাছড়া ঝলসে গেল। বিকৃত হল সাংঘাতিকভাবে। কয়েক লহমার মধ্যে গোটা শহরটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

একটা শহর বদলে গেল শ্মশানে।

আর এই ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রিন্সটন শহরে নিজের ঘরে নিঃশব্দে বসেছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

সকালের রোদ ঝলমল করছে বাগানে, রঙ-বেরঙের ফুল ফুটেছে গাছে গাছে, জানা-অজানা অজস্র পাখ-পাখালি ডাকছে খুশিতে। প্রজাপতির রঙীন ডানায় নানা রঙের ঝিলিক। কিন্তু প্রকৃতির বুকে এই মন ভুলানো দৃশ্য আজ আর বিজ্ঞানীকে আকর্ষণ করতে পারছে না। তাঁর মন চিন্তাগ্রস্ত··বিক্ষুব্ধ। পারমাণবিক বোমা জাপানে যে সংহার-লীলা ঘটিয়েছে তার বিবরণ তাঁর মন বেদনার্ত করে তুলেছে।

আইনস্টাইনই একদিন পৃথিবীর মানুষকে পারমাণবিক শক্তির কথা শুনিয়েছিলেন। আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেণ্টের কাছে লেখা তাঁর চিঠির ফলেই আমেরিকায় পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য গবেষণা শুরু হয়। আজ তাই এই বোমা বর্ষণের এবং সংহার-লীলার দায়িত্ব তাঁর।

তিনি বিক্ষুব্ধ মনে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছেন।

বার

উনিশ শ' পঞ্চান্ন সাল।

আইনস্টাইনের ছিয়াত্তর বছর বয়স পূর্ণ হল।

আজও তিনি বিজ্ঞানী···বিজ্ঞান সাধক। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বিশ্বযুদ্ধের পর নবীন ইসরাইল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। বিশ্বের

যাযাবর ইহুদীরা পেল তাদের বাসভূমি।

ইসরাইল সরকার আইনস্টাইনকে আহ্বান জানাল নবীন সরকারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য।

জিভ্ কেটে বললেন তিনি—আমি বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ নই!

এখনও মাঝে মাঝে তিনি অধ্যাপক আর অ্যাডভান্সড বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তিনি···সারা দেশের এক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর হাতের লেখাগুলো মুছে ফেলা হয় না। এগুলো জাতীয় সম্পদ। তাই যত্ন করে রেখে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু বছরের প্রথম থেকেই আইনস্টাইনের দেহ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তাঁকে প্রিন্সটন হাসপাতালে ভর্তি করা হল।

একটু সুস্থ হলেন। স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন। কয়েকজন ছাত্র আর অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দু' চারটে কথা বললেন। হাসপাতালের কর্মীদের বিরক্ত করছেন বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রদীপ নিভবার আগে যেমন তার শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠে একেবারে হারিয়ে যায় গভীর অন্ধকারে···তেমনি সুস্থতা ফিরে পেলেন আইনস্টাইন। এবং তা সাময়িকভাবে।

তারপর···

আঠারই এপ্রিল। মাঝরাত। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রিন্সটন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মানব ইতিহাসে তাই এই বছরটা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর চিতাভস্ম নদীর জলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফল রয়েছে চিরন্তন হয়ে। তাঁর গবেষণার ফল মানবসমাজের কাছে এক অক্ষয় সম্পদ।

—:০:—